পঞ্চতীর্থ

প্রবোধকুমার সান্যাল
প্রণীত

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
কলিকাতা

উৎসর্গ

৺দীনেশরঞ্জন দাশ

বন্ধুর স্মরণে—

প্রবোধকুমার সান্যালের অন্যান্য বই

—উপন্যাস—

নদনদী
আলো আর আগুন
জয়ন্ত
নববোধন
দেবীর দেশের মেয়ে
স্বাগতম্
অগ্রগামী
ঝড়ের সঙ্কেত
নবীন যুবক
ঘুমভাঙার রাত
সরল রেখা
প্রিয় বান্ধবী
কাজল-লতা

—গল্প—

কয়েক ঘণ্টা মাত্র
বন্যাসঙ্গিনী
তরঙ্গ
অঙ্গরাগ
নিশিপদ্ম
দিবাস্বপ্ন
অবিকল
চেনা ও জানা

—ভ্রমণ কাহিনী—

ইতস্ততঃ
মহাপ্রস্থানের পথে
দেশ-দেশান্তর
অরণ্যপথ

—চিত্রোপন্যাস—

আগ্নেয়গিরি
সায়াহ্নে
রঙীন সূতো
কলরব
তরুণী সঙ্ঘ
যাযাবর

—প্রবন্ধ—

মনে মনে

ক্যামেরাম্যান

পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময় হোলো সিনেমা। জড়বাদীর বিজ্ঞান-চক্রান্তে ছবির মানুষ কথা বলে, সৃষ্টিরহস্যের আদি বিধাতারও ধারণাতীত। মিথ্যা স্ত্রী-পুরুষের কল্পিত হাসি-কান্নার কাহিনী দেখাশোনার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। প্রকাণ্ড মিথ্যার উপরে প্রকাণ্ড আয়োজন।

অতনু সেদিন ট্রেনের কামরায় ব'সে গল্প জমিয়ে তুলেছিল। বললে, সত্যি-মানুষের চেহারা আর কোনো সান্ত্বনা দিচ্ছে না। রুগ্ন, নিরুপায়, প্রকাশভীরু—তাদের আর কোনো পরিচয় নেই। জ্যান্ত স্ত্রী-পুরুষ আজকের দিনে ভালো কথা বলতে আর ভালো কাজ করতে ভুলে গেছে।

বলো কি, অতনু?—ডিরেক্টর বললেন, পৃথিবীতে এত বড় বড় কীর্তি, এত আদর্শ প্রচার—

অতনু বললে, কীর্তিই আজকে সর্বনাশের মূল, সেগুলো আত্মাভিমান আর দম্ভে স্ফীত,—আজকে কালাপাহাড়কে নিয়ে ছবি তুলতে পারি। সমস্ত সে ভেঙে দিচ্ছে। বরঞ্চ বিশাল

একটা নতুন অপরাধ সৃষ্টি হোক, কিন্তু পুরোনো অভ্যস্ত দুর্নীতি সব ভেঙে যাক্।

শ্রীমতী মাধুরীলতা এবং আরো এগারোটি মেয়ে তাদেরই সহযাত্রিনী। শ্রীমতী বললেন, কালাপাহাড় কি, অতনু বাবু?

ডিরেক্টর বললেন, পাঠান যুগের একটি ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তিনি হিন্দু ছিলেন, পরে মুসলমান হয়ে মন্দির-টন্দির সব ধ্বংস করেন।

অতনু বললে, না, কালাপাহাড় একটা আইডিয়া। তার কোনো ধর্ম নেই, কারণ সে ছিল মহৎ বর্বর। বিশাল এক সভ্যতার বিপক্ষে তার অভিযান। কোনো আইডিয়ারই রাশ আলগা করা যায়না জীবনে, চারিদিকে থাকে শাসন, আষ্টেপৃষ্ঠে হাত-পা বাঁধা। কিন্তু ছবিতে? তুমি তোমার স্বভাবের, তোমার আসল প্রকৃতির খিল খুলে দিতে পারো? কালাপাহাড় জীবনে তাই করেছিল।

সেটা পাগলামি নয়?

ফ্লাস্কের চায়ের সঙ্গে একটা ট্যাবলেট্ মুখে দিয়ে গিলে অতনু বললে, না, চিন্তার সঙ্গতি থাকবে নৈলে রসভঙ্গ। 'ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্টের' কথা স্মরণ করুন,—প্যাথলজি হ'তে পারে, পাগলামি নয়। সিনেমার জন্যে এত টাকা মানুষ খরচ করছে কেন? তারা আবিষ্কার করতে চাইছে

নিজেদের প্রকৃতি, জানবার চেষ্টা করছে নিজেদের অর্থ কি, খুঁজে বেড়াচ্ছে কেবল আপন আপন চেহারা। যা সম্ভব হয়না জীবনে তাই ঘটছে ছবিতে, অদ্ভুত না ?

বীণাবতী ওধার থেকে ঝুঁকে প'ড়ে প্রশ্ন করলে, অদ্ভুত কেন, অতনুবাবু, এইত নিয়ম। ছবিতে ঘটছে তাই কোনো ভয় নেই, কেউ তেড়ে আসবেনা ; এ কি কম সুবিধে ? ছবিতে প্রকৃতির খিল খুলে দেওয়ায় তৃপ্তি কি কম ? বেশ ত নিজের চেহারাই হোক,—নিজের বেপরোয়া স্বাধীনতা দেখলে কা'র না আনন্দ হয় ?

ডিরেক্টর বললেন, আহা, তোমাদের মনস্তত্ত্বের কথা এখন থাক্‌—বর্মা চুরুটটা ধরিয়ে তিনি পুনরায় বললেন, ছবির কথা হোক। আঃ, রাখো না অতনু তোমার ক্যামেরাটা পিঠ থেকে নামিয়ে। খুলে ফেলো ফিতেটা।

অতনু ক্যামেরাটা বাগিয়ে নিয়ে হেসে বললে, না, এটা আমার সঙ্গের সাথী। আর ত কিছু পারলুম না, যা কিছু দেখবো তারই ছবি তুলবো, যা বুঝতে পারবো না তারও ছবি। মানে, হয়ত ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছিনে, তবে ধরুন, যা সহজ আর সাধারণ, ছবিতে তাকেই ক'রে তুলবো অস্পষ্ট, রহস্যময়।

সে আবার কি রকম হে ?

অনেকটা নিরাশায় আর সন্দেহে সুন্দর সেই ছবি।

বীণাবতীরা হেসে উঠলো। বললে, এ বেলাকার মতন আপনার ছুটি। নিন্ ঘুমিয়ে পড়ুন, আইডিয়ার জটে জড়িয়ে গেছে আপনার বুদ্ধি।

বাঁ হাতের দু' আঙুলের ফাঁকে অতনুর সিগারেটটা পুড়তে লাগলো। নেশায় দুই চোখ তার ঘুমে জড়িয়ে এলো।

পশ্চিমের হিন্দুস্থানী শহরটির ছোট্ট স্টেশনে ওরা যখন সবাই নামলো তখন একটা সমারোহ দেখা দিল। সমস্ত ট্রেনখানায় তাদের নিজেদের লোক কম নয়। আটজন চাকর, জনচারেক পাচক, তিনজন দাসী। এদিকে জন চল্লিশেক স্ত্রী-পুরুষ। সঙ্গে প্রায় পনেরোটা বড় কাঠের বাক্স, অসংখ্য স্যুটকেস আর হোল্ড-অলে বাঁধা বিছানা। আগে থেকে এই শহরের একান্তে মাঠের মধ্যে তাদের তাঁবু ফেলা আছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জল আর আলোর ব্যবস্থা প্রস্তুত রেখেছেন, সুতরাং খুব বেশি অসুবিধা হবে ব'লে মনে হয় না। ওদের সকলকে নামিয়ে পথ নির্দেশ করার জন্য লোক মোতায়েন আছে। ছোট শহরের পক্ষে এত বড় ঘটনা আর কোনোদিন ঘটেনি। আশপাশের পাহাড়ী গ্রামগুলিও সচকিত হয়ে উঠলো।

তাঁবুগুলি পড়েছে শহরের বাইরে পাহাড়ী উপত্যকার প্রান্তরে। পাশেই ছোট নদী, নাম সিস্তুয়া। সিস্তুয়ার আসল নাম সুস্মিতা, অতনু এখানে ওখানে খবর নিয়ে জানলো।

সুস্মিতা,—অদ্ভুত নাম বটে! নদী না ব'লে পার্বত্য নির্ঝরিণী বললেই মানায়! এখন বর্ষার শেষ, সামান্য ঢল নেমে এসেছে পাহাড় থেকে, তাতেই সুস্মিতার কৈশোরে তারুণ্য এসেছে! অতনু শহরে মানুষ, শহরের শিরা উপশিরার রক্ত-ধারার সঙ্গে তা'র স্খলিত জীবনের আবাল্য পরিচয়, এই উপত্যকা আর সুস্মিতাকে ঘিরে একটি নির্জন বিশ্রাম পাওয়া গেছে,—অতনু তার অতিশ্রান্ত জীবনে একটি নতুন আস্বাদ পেলো।

সিনেমা পার্টিতে অতনুর প্রাধান্য কম নয়, সে ক্যামেরা-ম্যান। সেট্ তৈরি করার পরিশ্রম তার নেই তবে স্থান কাল এবং পারিপার্শ্বিক নির্বাচনে তার মতামত গ্রাহ্য। অত্যন্ত সামান্য কথায়, সহজবোধ্য যুক্তিতে ডিরেক্টরকে সে নিজের দখলে আনতে পারে, সে জন্য আর কেউ তার কথায় তর্ক করে না। অতনুর চরিত্র সম্পর্কে যে কোনো প্রশ্নই উঠুক,—সে পণ্ডিত। তর্কজাল বিস্তার করার পাণ্ডিত্য তার নয়, নিজেকে সে প্রকাশ করে, ফলে অন্যেও প্রকাশিত হয়। চেহারায় তার অসাধারণত্ব নেই, বহুর মধ্যে হারানো তার পক্ষে অসম্ভব নয়, কিন্তু কাছাকাছি এসে দাঁড়ালে মনে হয় সে ভয়ানক তীব্র, তার স্বজ্ঞা ফুটে বেরিয়ে পড়ে সর্বাঙ্গে, তার মুখের দিকে তাকালে নিজের মধ্যেই যেন একটা যন্ত্রণা বোধ হয়! রংটা তার ফর্সা, কিন্তু চোখ দুটো ছোট। মানুষটা পাৎলা হোক, কিন্তু হাত দুখানা দীর্ঘ আর বলিষ্ঠ। মাথার দুই দিকে তার

সামান্য টাক, কিন্তু বাকি চুলগুলি এতই দৃঢ় আর কর্কশ যে ভয় করে, অতনুর প্রাণের মধ্যে একটা বর্বরের বাসা। এখানে তাকে দেখলেই মনে হ'তে পারে এখানে তার জায়গা নয়, সিনেমা জগতে এসেছে সে গায়ের জোরে। তার জায়গা ছিল কোনো স্বাধীন দেশের কূটনীতিক গোয়েন্দা বিভাগের অধিনায়ক পদে। কিন্তু আসলে টেনেছে তাকে ছবির রহস্য। যা গতিশীল ছবিতে তা স্তব্ধ; বিজ্ঞানের একটা নকল যান্ত্রিক প্রাণশক্তি সেই স্তব্ধকে চলৎশক্তিশীল ক'রে তোলে। প্রশ্ন ওঠে অতনুর মনে। মাথা দুলিয়ে হেলিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে এই রহস্যের অটল দেওয়াল তার দুই ক্ষুদ্র চোখের দৃষ্টিতে যেন বিদ্ধ করতে থাকে। গোখরো সাপ যতই নড়াচড়া করুক তার তীব্র দৃষ্টি অপলক; অতনু তেমনি উত্তর জানবার চেষ্টায় এক রকমের হিংস্র হয়ে ওঠে। যান্ত্রিক এসে তার কাছে সমস্তটা বিশ্লেষণ ক'রে বুঝিয়ে দেয়,—তবু প্রশ্ন থেকে যায়, অন্তর্নিহিত প্রাণ স্ফুরিত হচ্ছে কোন্ সঙ্কেতে? কিন্তু উত্তর নেই। বিশ্বে সর্বব্যাপী আছে বিদ্যুৎ,—যন্ত্রে তাকে আনা গেছে। সুইচ টিপলে আলো জ্বলে, পাখা ঘোরে, মেসিন চলে। সৃষ্টির আদিমূলে আছে ঈশ্বর,—তার ছবি ওটে না, তাকে যন্ত্রে আনা যায় না। প্রকাণ্ড প্রশ্ন ওঠে অতনুর হৃদ্‌-পিণ্ডে। সে যন্ত্র কই?

সুস্মিতার তট ঘেঁষে একেবারে বালুপাথরের ওপরেই অতনু

নিজের তাঁবু বেছে নিয়েছিল। সম্মুখের উপত্যকাময় প্রান্তরের নিরবচ্ছিন্ন জনশূন্যতার অবকাশ তার হুকুমের মধ্যে। সারাদিন ভ'রে একটি নীল মায়া দোলে। সৃষ্টিতত্ত্বের একটি অপরূপ সংশয় আলোছায়ার খেলায় অতনুর মনে মোহজাল বুনতে থাকে। সূর্যোদয়ের সংবাদ আগে আসে সম্মুখে পপ্‌লারের শিরে, পরে আসে সুস্মিতার উপল-নূপুরে। দূর গোচারণের মাঠে বিন্দু বিন্দু প্রাণ, মানব সমাজে ওদের নাম গৃহপালিত পশু। তার পরে আসে নানা বর্ণের রঙীন পাখী,—অলক্ষ্য প্রকৃতির যন্ত্রশালায় ওরা তৈরী ছোট ছোট সুসমাপ্ত শিল্প। বিশাল বিশ্বসৃষ্টির সিনেমার পটে ওরা বাঙ্ময় আর গতিশীল ছবি। সেই ছবির কর্মশালা কোথায় ?

ক্যামেরাটা পিঠে ঝুলিয়ে অতনু তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়ে। এমন নয় যে, সে সুস্মিতার তীর ধ'রে প্রান্তরের কবিতার মধ্যে ব্যঞ্জনা খুঁজে বেড়ায়। সে নিঃসঙ্গ হ'লেও নিজের ভিতরকার সহস্র প্রশ্নে সে কোলাহলমুখর,—সকলের ভিতরে গিয়ে সকলের মধ্যে থাকার সময় তার নেই। সকাল বেলায় প্রভাত সূর্যকে লক্ষ্য ক'রে পাহাড়ের চূড়ার উপর দিয়ে উড়ে যায় শাদা হাঁসের দল,—শরৎ শেষের শিশিরবিন্দু তখনো মরেনি,—সেই ছবি অতনুর চাই। মধ্যাহ্নে মাঠের বাষ্পীয় রসায়ণে সূর্যরশ্মির সঞ্চালনে এক প্রকার বেগুনী রক্তিম শিখা জ্বলতে থাকে, সে ছবি অতনু ভোলে না। জীবনকে সে

দেখলো ছবির ভিতর দিয়ে, সিনেমার গল্পে সে দেখতে পেলো আসল প্রাণ,—মানুষ যেখানে স্বভাবকে লুকোয় না, তার অন্তর্জগতের ভাব-অনুভাব ছবির পর্দায় নাচে। মালতী তাকে একদিন বলেছিল, 'এত' আর আপনার চাক্‌রি নয়, এ আপনার নেশা।

কি করে জানলে ?

টাকা যা রোজগার করেন উড়িয়ে দেন্ তার পাঁচগুণ। বড়লোকেরা হচ্ছে বেনোজল, তারা ঢুকলে সিনেমাও নষ্ট হয় নিজেরাও চুলোয় যায়।

অতনু হেসে বলেছিল, আমার প্রতি তোমার এই প্রচ্ছন্ন দরদের কারণ কি, মালতী ?

আঘাতে মালতীর মুখখানায় অপমানের রক্তিম ছবি ফুটে উঠলো। বাঁকাঠোঁটে বিকৃত কণ্ঠে সে যাবার সময় ব'লে গেল, আপনাকে পছন্দ করি কিনা, তাই।

ক্লিক্ ক'রে ক্যামেরায় উঠে গেল তার ছবি। ছবি তুলে অতনু আবিষ্কার করলো, রোষ ও ব্যর্থতায় মালতী কি তীব্র, কী সুন্দর!

মেয়েরা কোনোদিনই অতনুকে পছন্দ করতে পারেনি। অতনুঃ প্রকৃতিতে নির্লেপ আছে ব'লে নয়, বিজ্ঞান-শিল্পীর একটা নির্দয় পরিহাসবুদ্ধি তার দুই সূচ্যগ্র চক্ষে জ্বলতে থাকে সেই কারণে। তার চোখের দৃষ্টিতে মেয়েদের অপলাপবৃত্তি

উদ্‌ঘাটিত হয়ে ওঠে। তারা কাছে ছুটে আসে দুরন্ত মোহে, পালিয়ে যায় দুর্দান্ত তাড়নায়।

ছবি তোলবার আয়োজন চলেছে। এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে গিয়ে পাহাড়ের উপর ডিরেক্টর পুরন্দর সেন গল্পের সেট্ তৈরিতে ব্যস্ত আছেন। গল্পটায় নতুনত্ব বিশেষ কিছু নেই। পাহাড়ী এক সামন্ত রাজার দেশ। তার মন্দিরে থাকেন তরুণ ব্রাহ্মণ পূজারী। দেবদাসী বিলাসিনী কমলমণি রাজার রক্ষিতা,—সেই নারীর প্রচুর ঐশ্বর্য। রাজার মন্দিরে দেবতার সম্মুখে কমলমণি নৃত্য করেন। তাঁর নৃত্যের ভাবে বৈষ্ণবসুলভ আত্মদানের কারুণ্য জেগে ওঠে। তরুণ পূজারী মুগ্ধ হয়ে ধর্মপ্রাণা দেবদাসীর প্রতি প্রণয়াবিষ্ট হলেন। রাজার কানে উঠলো এই সংবাদ। ব্রাহ্মণের অধিকার তিনি খর্ব করলেন না বটে, কিন্তু দেবদাসীর পক্ষে মন্দিরদ্বার রুদ্ধ হোলো; অস্পৃশ্যের স্থান নেই মন্দিরে। এর পরে ঘাত-প্রতিঘাত সুরু হোলো। অরণ্যবাসিনী কমলমণি দেবদাসীদের নিয়ে মন্দিরপ্রবেশ আন্দোলন চালাতে লাগলেন। রাজার আনুগত্য তিনি ত্যাগ করলেন। ফলে, রাজরোষ গিয়ে পড়লো তরুণ ব্রাহ্মণের ওপর; ব্রাহ্মণ নির্বাসিত হলেন। নিরপরাধের এই শাস্তিতে রাজ্যে বিপ্লব জেগে উঠলো। অবশেষে কমলমণি একদা অন্ধকার রাত্রে দেবতার মন্দির-বেদীতে ব'সে গরলপান ক'রে এই বিপ্লবের অবসান ঘটালেন। মোটামুটি গল্পটা এই।

আয়োজন কম নয়। ইতিমধ্যে বড় ক্যামেরা নিয়ে গিয়ে অতনু সেই কল্পিত পাহাড়ী রাজ্যের কয়েকটি ছবি তুলে এনেছে। বিপ্লবের দৃশ্যটা তোলবার জন্য কোম্পানীর দু চারজন লোক আশপাশের পাহাড়ী গ্রামের জংলীদের নিয়ে ব্যবস্থায় ব্যস্ত আছে,—অতনুই সেই দৃশ্য নির্বাচন করবে। দেবদাসীদের কয়েকটি আরণ্যক পাহাড়ী নৃত্যের ছবি চাই; এমন গান এমন জংলী সুরে বাঁধতে হবে যাতে সেই পার্বত্য জাতির অন্তর্নিহিত প্রাণের মনোরম আস্বাদ থাকে। আরণ্যক মদিরতার মোহজাল সৃষ্টি করতে হবে নতুন পার্বত্য পরিকল্পনায়। সেই আঙ্গিক পদ্ধতি অতনু ছাড়া আর কারো হাতে খুলবে না। পুরন্দরের ভুল-ত্রুটি অতনু ছাড়া দেখিয়ে দেবে কে? বুদ্ধিমান পুরন্দর সেন তারই আভায় যে নিজেকে উজ্জ্বল ক'রে রাখেন।

বর্ষার জল-বৃষ্টি ধীরে ধীরে বিদায় নিয়েছে। শরৎকালের প্রথম দিকের কথা। কয়েকদিন আকাশ মেঘলা ছিল, অতনু কাজকর্ম স্থগিত রাখতে বলেছিল। সুবিধামতো এখানে ওখানে ঘুরে স্থানীয় গ্রাম ও পথ-ঘাটের দু চারটে স্ন্যাপ্‌ সে সংগ্রহ করেছে। তার বেশি কিছু নয়। নামজাদা অভিনেতা আর অভিনেত্রী যারা, তারা তাঁবুর মধ্যে প্রায়ই অভিনয়ের মহলা দিয়ে সময় কাটায়। কমলমণির ভূমিকায় অভিনয় করবেন মঞ্জুশ্রী গুপ্তা। নামটা অভিধান খুলে আবিষ্কার করা,

তার সঙ্গে গুপ্তা জুড়ে নকল বংশমর্যাদা আর আভিজাত্যের ছাপ দেওয়া হয়েছে। কারণ, আসল নাম পুঁটুমণি। তরুণ ব্রাহ্মণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন তরুণ নট রত্নেশ্বর গুঁই। রাজার অংশ গ্রহণ করবেন ধরণীধর মাড়। কলিকাতার সব নামজাদা অভিনেতা! অভিনেত্রীদের চেহারা প্রকাশযোগ্য হোলেই হোলো, সেইটিই তাদের যোগ্যতা, অভিনয় না জানলেও চলবে। যশোলিপ্সু স্ত্রীপুরুষদের নিয়েই এ কোম্পানীর কারবার সুতরাং বেতন তাদের কিছু নেই, কেবল তাদের ব্যবহার ক'রে নেওয়া, এই মাত্র। এতে কোম্পানীর অনেক বাঁচে। সুরূপা কেউ থাকলে তার সঙ্গে অবিশ্যি চুক্তি ক'রে নেওয়া হয়,—রূপই পয়সা আনে। কিন্তু,—অতনু সিগারেটটা জ্বালিয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে, বাঙ্গালী মেয়ের রূপ!

দিন দুই থেকে দেবদাসী-নাচের এবং নায়িকার বিলাস-পুরীর জন্য একটা সেট্ তৈরী হচ্ছিল। এখান থেকে মাইল দুই পাহাড়ের চড়াই পেরিয়ে এক চিড়গাছের জঙ্গলের ধারে অতনু স্থান নির্বাচন ক'রে এসেছে। জায়গাটা অনেকটা সমতল অধিত্যকার মতো। কাছাকাছি ছোট মহকুমার দুই চারিটি কাছারিবাড়ী দেখা যাচ্ছে। পাশেই একটা বড় ঝরণা ঝিরঝিরিয়ে চলেছে। সরকারি জলের পাইপ আছে। পশ্চিমের উৎরাই পথটা ধ'রে গেলে রেল স্টেশনও এখান থেকে বেশি দূর নয়। শহরটির নাম রাহানা। এটিকে গল্পের

রাজার রাজধানী করা চলবে। এখানকার অরণ্যময়তা অতনুর খুব ভালো লাগলো। বাতাসে বাতাসে, পত্র মর্মরে রয়েছে মসলা আর ওষধিলতার কেমন একটা কটু-মধুর গন্ধ, নিবিড় ক'রে অতনু তার ঘ্রাণ নিল। সৌরভটা ঘন, মস্তিষ্ককে অভিভূত করে ক্ষণে ক্ষণে; কিন্তু এই ঘন সৌরভের ছবি ক্যামেরায় আসবে না, আসতে পারলে তাদের জংলী নৃত্যটা সার্থক হেতো। অতনু ভাবলো, আবেশটা আনা যেতে পারবে আলো ছায়ার চক্রান্ত-সৃষ্টিতে, দর্শকরা আস্বাদ পাবে গন্ধের। যা দৃশ্যগোচর নয়, অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে যা অজ্ঞাত, সেইদিকে তার প্রাণ চিরকাল উৎসুক। অন্ধ আকাশে তারকার দ্যুতিকম্পন তার স্নায়ুতন্ত্রের মূলে চাঞ্চল্য জাগিয়ে তোলে। বিজ্ঞান একদিন ক্যামেরার প্লেটে এই চিত্তরহস্যের সংবাদ দেবে। বীজের ভিতর থেকে অঙ্কুর কাঁদে আত্মপ্রকাশের যন্ত্রণায়, বাঙ্ময় ছবিতে শোনা যাবে সেই কান্নার কলরোল। অতনুর ছোট দুই চোখ আবার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো।

আয়োজন সম্পূর্ণ। অপরাহ্নের আগেই অতনু ক্যামেরা ঘুরিয়ে ছবি নেবে। অরণ্যবাসিনী দেবদাসীরা কমলমণিকে ঘিরে নাচবে! রাজদূত এসে কঠোর সংবাদ জানাবে! এমন সময় রাহানার উপর দিয়ে ছুটে এলো কালো মেঘ দুরন্ত দৈত্যের মতো।

পাবত্য বর্ষার চেহারা কারো জানা ছিলনা। পুরন্দর

সেনের মুখখানা বিষণ্ণ হয়ে এলো। ছবি তোলা স্থগিত রাখার অর্থ, কোম্পানীর অনেক অর্থ অপব্যয়। দেখতে দেখতে চিড় আর পপলারের চূড়ায় আসন্ন ঝড়ের সংবাদ এলো। বন্য হাঁসের দল ঝড়ের চেহারা দেখে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে দ্রুত উড়ে চলেছে, তাদের ধাবমান ডানার ঝাপট আর শূন্যপথে চূর্ণ কণ্ঠস্বর. অতনুর বুকের রক্তকে উদ্দাম ক'রে তুললো। ছবি চাই, ছবির কথা মনে পড়তেই আকাশে সেই ঝড়ের ডাক আর কলকণ্ঠী উড্ডীন হাঁসের দল ক্যামেরার শিকারে ধরা পড়লো ; আলুথালু অরণ্যও ছোট্ট লেন্সে হোলো বন্দী।

বৃষ্টিতে আশ্রয় কোথাও নেই। ঝড়ের বিতাড়নে আর বৃষ্টির চাবুকে অরণ্যের ভিতরে যেন সর্বনাশ ঘট্‌ছে। অতনুর ক্যামেরা আবার ক্লিক্ ক'রে উঠলো। রুদ্রচণ্ডের একটি পলকও সে ব্যর্থ যেতে দেবে না। মেয়েপুরুষ সাজসজ্জা সুদ্ধ ভয়ে দৌড়তে আরম্ভ করেছে, কোম্পানীর আয়োজন চূর্ণ বিচূর্ণ হোলো, জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড—পার্বত্য ঝড় বৃষ্টির বিভীষিকা, অতর্কিত করোকাপাত,—পুরন্দরের পার্টি ছিন্নভিন্ন হয়ে পালাতে লাগলো তাদের তাঁবুর দিকে। কোম্পানীর লোকের হাতে এবার অতনু বড় ক্যামেরাটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হোলো।

প্রকৃতিবিপর্যয়ের চিত্রগুলি ক্যামেরার মধ্যে সংগৃহীত রইলো, পুরন্দর জানতে পারেন নি। গল্পের বিপ্লবটা রইলো

অভিনেতা আর অভিনেত্রীদের দিশাহারা পলায়নে, সে-সংবাদও পুরন্দরের অজানা। এর পর গল্পে ঋতুপরিবর্তনের পালায় ঝড় বৃষ্টির চিত্রগুলি যে কাজে লাগানো যাবে, অসতর্ক ডিরেক্টর সে-কথা ভাবতে পেরেছেন? কিন্তু আর ভাবনার অবকাশ নেই,—অতনু ঝড়ে আর বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে রাহানার দিকে ছুটতে লাগলো। অত ক্ষয় ক্ষতি আর গণ্ডগোলে তার খবর আর কেউ রাখতে পারলো না।

বিপরীত পথে রাহানার কাছারিগুলো লক্ষ্য ক'রে আশ্রয়ের জন্য সে ছুটে চললো। পাহাড়ী পথ, দ্রুত যাওয়া সম্ভব নয়। তার পরণের আল্‌গা পায়জামা, শার্ট, কোট, ক্যাম্বিসের জুতো, পিঠে ঝোলানো ক্যামেরা,—বৃষ্টিতে একাকার হ'তে আর কিছু বাকি রইলো না। চেহারাটা হোলো উদ্‌ভ্রান্ত পর্যটকের মতো। সর্বাঙ্গে জলের ধারা নামছে। কাছাকাছি একটা ঝরণা দেখে ভিজা হাত ভিজা জামার পকেটে ঢুকিয়ে অতনু একটা ওষধি-ট্যাবলেট্ বা'র ক'রে মুখে দিল, তারপর ঝরণার জল অঞ্জলী ভ'রে পান করলো। মাদক বস্তুতে মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন না ক'রে আজকে আর উপায় নেই।

রাহানার লোকালয়ে সে যখন এসে পৌঁছলো, তখন শরতের বিশ্বাসঘাতক আকাশে আবার নীলিমার মাধুর্য দেখা দিয়েছে। শূন্যের বর্ষা ছিন্নভিন্ন ক'রে আবার জ্যোতির্ময়ের রশ্মিচ্ছটা নামলো সানুদেশে আর প্রান্তরে।

প্রথমেই একটা সরকারি পি-ডবলু-ডি'র বাংলা পাওয়া গেল। তার এই পাগলের বেশটাকে কিছু ভদ্র না ক'রে তুলে আর উপায় নেই। অন্তত, একটু, যদি কিছু সুবিধা পাওয়া যায়। .এক পেয়ালা চা,—এক টাকা অতনু এখনই খরচ করতে পারে।

বাংলার গেট্এর কাছে এসে থমকে দাঁড়াতেই ভিতর থেকে পাহাড়ী চাপরাশি এগিয়ে এলো। প্রচ্ছন্ন ভদ্রলোক আছে অতনুর সাজসজ্জার নীচে, চাপরাশি সন্দেহ করলো। বললে, ক্যা, ফরমাইয়ে ?

অতনু বললে, চা কিন্‌তে মিলেগা ?

ভাষাটা দুর্বোধ্য। চাপরাশি প্রশ্ন করলে, কাঁহাসে আ রহা হুঁ ? আপ তামাসাওয়ালে হুঁ ? হুজুরকো নে বোলাউঙ্গা ?

বলতে বলতেই বাংলার দালানে তথাকথিত হুজুর এসে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখে কৌতূহল। চেহারাটা টকটকে। হোমরা চোমরা সাহেবী পোষাকে তিনি হয়ত সান্ধ্যভ্রমণে বেরোচ্ছিলেন। আগন্তুক দেখে তিনি নিজেই এসে দাঁড়ালেন। এই দুর্গম দেশে নবাগত কেউ নয়, আগন্তুক কেউ কখনো আসে না।

অতনু তাঁর দিকে তাকালো তার সেই সূচ্যগ্র দৃষ্টি তুলে। হুজুরও স্তব্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে অপলক চেয়ে রইলেন। নাটকীয় কয়েকটি মুহূর্ত। বিস্ময়ে আর বিস্ময়ে সংঘাত।

তৃতীয় ব্যক্তি কেউ থাকলে একটা উঁচুদরের 'ক্লোজ আপ' নিতে পারতো।

অনেকক্ষণ পরে সহসা হুজুর হাত বাড়িয়ে তার পিঠের ওপর রাখলেন। উল্লসিত হয়ে বললেন, চিনতে পারো, অতনু ?

হাসিমুখে অতনু বললে, না চিনলেই ভালো হোতো।

কেন ?

অতনু বললে, বোধ হয় বছর বারো হবে, না ?

হুজুর নিশ্বাস ফেলে বললেন, বোধ হয় বেশি। এসো ভেতরে।

*

* *

*

সনির্বন্ধ অনুরোধে অতনু পরিচ্ছদ ত্যাগ করতে বাধ্য হোলো। প্রণবেশ তাকে নিজের পায়জামা আর শার্ট পরিয়ে ছাড়লো। অন্তরঙ্গ বন্ধুতার পক্ষে বারো বছর বেশি নয়, সে ব্যবধান পার হতে প্রণবেশের দেরি হোলো না।

বারান্দায় চায়ের সঙ্গে জলযোগের আসর বসলো। প্রণবেশ ওভারশিয়ার থেকে ইন্‌জিনিয়র। এখানেই তার চিরস্থায়ী বাসা। সে বিবাহ করেছে। দুটি ছেলে। সেই থেকে দেশছাড়া, দেশে আবার ফিরবে পেন্‌সন নিয়ে।

এখানকার জল-বাতাস খুব ভালো। সেই কৃশকায় প্রণবেশ আর নেই, এখন গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়। বয়স পঁয়ত্রিশ পেরিয়ে এসেছে।

তুই বিয়ে করেছিস কদ্দিন? ছেলেপুলে কি?

অতনু বললে, পৃথিবীর সবাই আমার সন্তান। আরে, ঘরকন্না করলুম কবে যে, ছেলেপুলে হবে?

কেন?—প্রশ্ন করলে প্রণবেশ।

স্ত্রী আমার কাছে থাকেন না। —অতনু বললে, আমিও থাকিনে বাড়ীতে।

এর পরে ও-আলোচনাটা বেশি দূর চলা উচিত নয়। হয়ত আর কোনো প্রশ্ন অতনুর পক্ষে অসুবিধাজনক। প্রণবেশ সতর্ক হয়ে কেবল বললে, লক্ষ্মীছাড়া!—সিনেমায় কি কাজ করিস?

অতনু বললে, এই ছবি-টবি তুলি।—এই ব'লে সে চায়ের বাটিতে চুমুক দিল। প্রণবেশ তার সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিল। তার ব্যবহারে কেমন একটা অভিভাবকতার ভান আছে,—সেটা পীড়াদায়ক, সন্দেহ নেই। কিন্তু পীড়া দিলেও এখন তাও ভালো লাগছে। অতনু জীবনের জুয়াখেলায় হেরে গেছে, সংসারের ধারণা এই। প্রণবেশ হিসাবী, তার আচরণেই প্রকাশ। তার মোটা চাকরি, গোছানো সংসার, সন্তানের পিতা, জমানো টাকা, হয়ত সুন্দরী স্ত্রী, ভবিষ্যতে

২

পেনসন;—সে যদি সস্নেহে লক্ষ্মীছাড়া বন্ধুর পিঠ চাপড়ায়, এমন কী অন্যায় ?

পেয়ালা শেষ ক'রে অতনু হাসিমুখে বললে, এর পরে বোধ হয় জিজ্ঞেস করবি, কত মাইনে পাই, চরিত্রটা ভালো আছে কিনা ? তার উত্তরে ব'লে রাখি, মাইনে নেহাই কম পাইনে। তবে সে-টাকা গিয়ে কয়েকটা বিশেষ দোকানের খাতায় জমা হয়। জমাতে কিছু পারিনি।

প্রণবেশ হেসে বললে, আর চরিত্রটা ?

বিয়ে করলে চরিত্রের প্রশ্ন আর ওঠে না। তবে হ্যাঁ, নিন্দে টিন্দে একটু আধটু রটে। খবরের কাগজে খ্যাতি কিছু আছে, সুতরাং নিন্দেটা গা সওয়া।—এবার আর এক পেয়ালা চা দিতে বল্ দেখি ?

মাদক ট্যাবলেটের রঙে অতনুর চোখ দুটো রাঙা হয়ে এসেছে। প্রণবেশ আর কিছু বললেনা, তবে তার অভিভাবকের ভঙ্গী কিছু সহজ হয়ে এলো। সে আর এক পেয়ালা চায়ের হুকুম দিল।

বারো বছর আগেকার জীবনস্মৃতিতে আর অতনুর তলিয়ে যাবার রুচি নেই। সেখানে হয়ত কাঁটা আছে, রক্তক্ষরণ আছে,—আরো যদি কোনো অন্ধ নিগূঢ় প্রশ্ন থাকে ত থাক্, সেই গহ্বরে হাত বাড়িয়ে আজকে আর লাভ নেই। বারো বছরের একটা পরিবর্তন আছে অতনুর ইতিহাসের পৃষ্ঠায়,

কিন্তু আশ্চর্য, তার নদী বাঁরে বারে মুছে নিয়ে গেছে তট থেকে স্মৃতির জঞ্জাল. নতুন পলিমাটিতে নতুন ফসল ফলেছে বারম্বার। প্রণবেশ তার সত্যকার অন্তরঙ্গ ছিল, যতদূর মনে পড়ে. কিন্তু সেই অন্তরঙ্গতা ভিন্ন পথযাত্রায় দিনে দিনে ফিকে হয়ে গেছে। সে-প্রণবেশ বেঁচে নেই, সেই অতনু মৃত। অসংখ্য হাঁসের দল যেমন দূর থেকে আকাশ-পথ দিয়ে উড়ে আসে, তেমনি অতনুর মনের সুদূর সীমানা থেকে উড়ে আসতে লাগলো সহস্র স্মরণের ছোট ছোট ঘটনা। কিন্তু সে মুখ ফিরিয়ে নিল, অতীতকে সে আর স্বীকার করবেনা!

অস্তকালের রক্তরশ্মির একটা ঝলক বারান্দার প্রান্ত হতে ধীরে ধীরে বিদায় নিল। অতনুকে অনেকটা পথ যেতে হবে। দুর্যোগে সে যে পথ হারায়নি, এর প্রমাণ না দিলে পুরন্দর সেন চারিদিকে লোক পাঠাতে পারেন। এদিকে সন্ধ্যা হ'লে পাহাড়ী-পথ অনেকটা দুর্গম মনে হয়। বিদায় নেবার জন্য অতনু ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বাংলার বারান্দায় চাকর আলো দিয়ে গেল।

এমন সময় দুটি মহিলার সঙ্গে দুটি বালক গেটের সামনে এসে ঢুকলো। বালক দুটি এলো দৌড়ে, একটি আর একটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। দুজনে এসেই প্রণবেশের গলা ধ'রে দাঁড়িয়ে নতুন অতিথিকে লক্ষ্য করতে লাগলো।

অতনু বললে, এই দুটি ছেলে বুঝি?

প্রণবেশ বললে, আর বলো কেন, দুই পায়ের দুই বেড়ি। আরে, তোমরা ওদিক দিয়ে পালাচ্ছ কেন? এসো, আমার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করো?

মহিলা দুটি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। প্রণবেশ বললে, এই আমার স্ত্রী অশ্রুকণা,—আর, একে ত তুই চিনিস রে, আমার ছোট বোন, প্রমীলা।

অস্পষ্ট আলোটায় ঠিক চেনা গেল না, তবে পারস্পরিক নমস্কার বিনিময় হ'য়ে গেল। যিনি স্ত্রী তিনি স্বল্প কথায় আলাপ সেরে ভিতরে গেলেন। আর যিনি ভগ্নী তিনি সহসা উচ্ছ্বাস ক'রে বললেন, শুনেছ দাদা, এক বাঙালী সিনেমা কোম্পানী এদিকে ছবি তুলতে এসেছে?

প্রণবেশ বললে, সেই ছবি যে তোলে সেই ত ব'সে রে তোর সামনে। তুই বুঝি ভুলে গেছিস অতনুকে?

বারো বছর পরে সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল প্রমীলা। অতনু এতক্ষণ পরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। বললে, প্রমীলা শুনলে চিনতে পারা কঠিন, আমি ওকে মিলি ব'লেই জানি।

বড় একটা নিশ্বাস প্রমীলার ভিতরে কোথায় যেন আটকিয়ে গিয়েছিল; তুষারের তীব্র বাতাসে জল যেমন জমে ওঠে। নিশ্চল ভূমিকম্পের মতো সংহত হয়ে সে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু এবার অবশ হাতখানা তুলে নিজের মুখে চাপা দিয়ে স্খলিত নিশ্বাসকে সে দমন করতে লাগলো।

কিন্তু সমস্তটাই মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের নাটক। পরক্ষণেই প্রমীলা হেসে বললে, মিলি কি আর আছে, কবে ম'রে ভূত হয়ে গেছে। অবাক হচ্ছি তোমাকে দেখে। উল্কার মতন ছিট্‌কে পড়লে কোথা থেকে?

অতনু হেসে বললে, উল্কারও কক্ষপথ আছে, কিন্তু আমি ধূমকেতু। শূন্যলোকের যাযাবর।

প্রণবেশ বললে, অতনুর ভয় ডর নেই। বৃষ্টির সময় রাহানার জঙ্গল দিয়ে এলো, ও-জঙ্গলে চার পাঁচটা লেপার্ডের বাসা। আজ ভারি বেঁচে গেছিস।

অতনু বললে, তোমাদের দেখে আমি অবাক্। এই অগঙ্গার দেশে তোমরা যে আছো আমার জানাই ছিল না। আচ্ছা, আজ আমি উঠি।

কিন্তু মেয়েদের কাছ থেকে অত সহজে অতনু কোনোদিন বিদায় নিতে পারেনি। অশ্রুকণা স্বামীকে ডেকে বললেন, তোমার এই দেশে ভদ্রলোকের সমাগম হোলো এই প্রথম। ওঁকে এখানে খেয়ে যেতে হবে ব'লে দাও।

পরিহাস ক'রে প্রণবেশ বললে, অতনু অতিশয় চরিত্রবান যুবক, স্ত্রীজাতির সেবা বোধ হয় অগ্রাহ্য করবেনা।

খেয়ে যেতে হবে শুনেই অতনু চঞ্চল হয়ে উঠলো। এটা অত্যন্ত স্থূল প্রস্তাব; এ সব মেয়েলি আতিথেয়তায় অতনু বিরক্তি বোধ করে। সস্তা সিনেমা-গল্পে ভোজনপর্ব অবতারণা

ক'রে যেমন আসর জমাতে হয়, এও তেমনি বিশ্রী। সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তোমার দাদাকে গিয়ে বলো, মিলি, আমি এখনই চলে যাচ্ছি। তাঁবুতে খুব তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, অনেক কাজ।

প্রমীলা বললে, মনে হচ্ছে তুমি পথে বেরিয়ে পড়তে পারলে বাঁচো, তাই না ?

কথা কয়েকটি কঠিন, তীক্ষ্ণ, তীব্র। কিন্তু অতনু সে ছেলে নয়, আঘাতকে আঘাত ক'রেই ফিরিয়ে দেয়। সে বললে, তুমি আবার মনের কথা জানতে শিখলে কবে ? বয়স কত হোলো ?

প্রমীলা হাসিমুখে বললে, মাত্র তিন বছরের ছোট তোমার চেয়ে, অর্থাৎ বত্রিশ।

তবে ত বুড়ি।—অতনু হঠাৎ তার আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখে বললে, তাইত, মিলি, তুমি বিধবা হ'লে কবে ?

মিলি বললে, দেখছি তুমি আগেকার সব অভ্যাস ভুলেছ, কিন্তু অসভ্যতাটা ভোলোনি।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে অতনু অবজ্ঞা ক'রে বললে, নারী নরকের দ্বার, শাস্ত্রে বলে। তাদের কাছে ব'সে গীতাপাঠ করা হাস্যকর। তারপর, কি খবর বলো। পাঁচ মিনিটের জন্যে দেখা, ঝগড়া রাখো।

প্রণবেশ আবার এসে দাঁড়ালো। বললে, ভাই, স্ত্রীর একান্ত অনুরোধ, তুই এখানে খেয়ে যাবি।

প্রমীলা বললে, সেদিন কি আছে দাদা, তোমার বন্ধু এখন মাতব্বর। খবরের কাগজে চারিদিকে সুখ্যাতি।

অতনু হেসে বললে, তোর বোন ত আমাকে একবারো খেতে বললেনা, এতদিন পরে দেখা।

সহজ শান্তকণ্ঠে মিলি বললে, দাদা বৌদিদি থাকতে আমি কেন অনুরোধ করবো? আমার কথা কি তুমি শুনবে?

অতনু বললে, বটে, একদিন যে হুকুম করতে?

প্রমীলা বললে, তখন ছিলুম ছাত্রী, এখন মাষ্টারনি।

প্রণবেশ বললে, ওঃ তোকে বলাই হয়নি এতক্ষণ, প্রমীলা এখানকার হিন্দী স্কুলের মাষ্টার। ও বেশ ভালো হিন্দী জানে। —পালাসনে যেন, ওকে ধ'রে রাখিস, প্রমীলা।—এই ব'লে সে ভিতরে গেল।

অতনু বললে, শুনলে ত? ধ'রে রাখতে ব'লে গেল।

প্রমীলা বললে, দাদা কি জানেন যে, তোমাকে ধ'রে রাখা যায় না?

অতনুর মুখে কেমন যেন অপরাধীর ছায়া ফুটে উঠলো। কথাটা সামান্য, কিন্তু অতীত যেন কথা ক'য়ে উঠেছে। দৈবের চক্রান্তে সে এখানে এসে ছিটকে পড়লো, কেবল বর্তমানের আয়নায় বারো বছর আগেকার ছায়া প্রতিবিম্বিত দেখতে।

সিগারেটটা পুড়ছে, অতনু বারান্দার বাইরে তাকালো। শুক্ল-পক্ষের শেষ দিক। শরতের জ্যোৎস্নায় একটি রোমাঞ্চ হর্ষ টলটল করছে। বাতাসের ঝলকগুলি পরিচ্ছন্ন, লঘু ও স্নিগ্ধ। সে বললে, আমাকে ধ'রে রাখা যায় না, কে বললে? এই ত সিনেমায় প্রায় তিন বছর কাটলো। যাকগে, তুমি কতদিন আছো এখানে শুনি।

প্রমীলা বললে, আট বছর।

স্বামী কতদিন মারা গেছেন?

প্রমীলা হাসিমুখে বললে, আবার ওই কথা! পারিবারিক আলাপে কাজ নেই, ওটা তোমার মৌখিক সৌজন্য। ক'দিন এখানে থাকবে বলো ত?

অতনু বললে, এখানে প্রায় কুড়ি দিন কাটলো। ঠিক বলতে পারিনে আর ক'দিন। কাজ নিয়মিত চললে আর দিন আষ্টেক দশ। নদীর ধারে তাঁবুতে থাকি, বেশ লাগে।

ওই নদীটার নাম সুস্মিতা, ওর গোড়ার দিকে গিয়েছ? ভারি দুর্গম পথ। আমাদের একদিন সাপে তাড়া করেছিল।

অতনু মুখ টিপে হেসে বললে, সাপ ত মেয়েদের তাড়া করে না, অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে আসে।

বিদ্রূপটা অনুধাবন করতে প্রমীলার দেরী হোলোনা। খানিকক্ষণ পরে সে বললে, কিন্তু সাপের ছোবল্টা?

ওটা ছোবল নয়, জিব বার ক'রে আত্মীয়দের সেলাম জানায়।

প্রমীলা বললে, মেয়েদের ওপর তোমার এই বিদ্রূপের ভাব ক'দিনের, শুনি ?

তাদের চিনতে পারার পর থেকে।—অতনু হাসলো।

অনেকক্ষণ প্রমীলা নত হয়ে রইলো। দেখলো না অতনুর মুখে চোখে কী নিঃশব্দ উল্লাস। এটা শালীনতা নয়, অতনুও জানে। বিদ্রূপ আর আঘাতে মেয়েদের মনে একরূপ মোহ সৃষ্টি করা যায়, এও তার অজানা নয়। তবু, অহেতুক আত্মপ্রসাদের লোভে কেমন একটা হিংস্রতা এই নতমুখীর কাছে প্রকাশ করতে ভালো লাগছে। এ ছবিটা মন্দ নয়, নিজের অজ্ঞাতেই তার হাতখানা সরীসৃপের মতো ক্যামেরার গা স্পর্শ করলো। একটা স্ন্যাপ নিতে তার লোভ হচ্ছে।

চাপা নিশ্বাস ফেলে প্রমীলা বললে, অঙ্ক কষা তোমার ভুল হয়েছে। মেয়েদের তুমি চিনতে পারোনি, অতনু।

অতনু হেসে বললে, তোমাকে অবশ্যি পারিনি, মানছি। যাক গে, এখানে তুমি আজকাল কেমন আছো, বলো ?

এখানে ?—প্রমীলা বললে, দিন মন্দ কাটেনা। অল্প বয়সের ভূত ঘাড় থেকে নেমে গেছে। বেশ থাকি এখানে। কিছু নতুনও নেই, কিছু জানবারও নেই। পাহাড় প্রান্তরের সঙ্গে আত্মীয়তা হয়ে গেছে। সামান্য জীবন, সাধারণ দিন

যাত্রা। দাদার কাছে থাকি, চাক্‌রি করি, মাঝে মাঝে খবরের কাগজ পড়ি, আর কিছু নয়। দাদার ছেলে দুটি আমার কাছেই লেখাপড়া শেখে।

কী শিক্ষা দাও ওদের?—অতনুর ঠোঁটে আবার বিদ্রূপ ফেটে উঠলো।

প্রমীলা বললে, আমার বিদ্যা কতটুকু বলো? কিন্তু ওরা বড় হয়ে নিরপরাধের ওপর বর্ব্বরতা না করে—এইটুকু ওদের শেখাই।—এই ব'লে আলোটার দিকে সে মুখ ফেরালো।

বেদনার একটা স্পর্শ রি রি ক'রে জ্বলতে লাগলো প্রমীলার কথায়। অতনু কল্পনা করলো, সে একটা গল্পের নায়ক, প্রমীলা নায়িকা। বাল্য প্রণয় ছিল তাদের। কিন্তু অবশেষে নায়ক চ'লে গেল উপেক্ষায়, নায়িকা রইলো প্রণয়ের তপস্যা নিয়ে সন্ন্যাসিনী। দুর্গম কোন্ এক অজানা দেশে নায়ক গেছে এক সিনেমা-পার্টির সঙ্গে—স্খলিত চরিত্র, মাদক জর্জর, খামখেয়ালী, নারীদ্বেষী, জীবনবৈরাগী। ঘটনার চক্রান্তে বিগতযৌবনা তপস্বিনী নায়িকার সঙ্গে দৈবাৎ সাক্ষাৎ। অতীতের দুই কঙ্কাল কথা কইলো পরস্পর। জ্যোৎস্নায়, নির্জন প্রান্তরে, অরণ্যছায়ায়—কোথাও খুঁজে পেলো না তারা হারানো অতীত, প্রাণের উত্তাপ, আগুন নেংড়ানো যৌবনের রস। অসহনীয় যন্ত্রণায় তারা দুজনে পালিয়ে গেল দুদিকে। গল্পটা মন্দ দাঁড়ায় না।

অতনু বললে, বত্রিশ বছর বয়স বললে, কিন্তু কপালে ত' তোমার একটিও রেখা পড়েনি মিলি ?

পড়েনি ? আশ্চর্য—প্রমীলা হেসে উঠে বললে, কিন্তু অনেকগুলো চুল পেকেছে মাথার মধ্যে, তুমি এখনো দেখতে পাওনি।

তার মানে,—অতনু বললেঃ ওপরে উদ্দীপনা নেই, ভেতরে দগ্ধ হয়েছ, কেমন ?

চাকর এসে টেব্‌লের ওপর এক প্লেট গরম শিঙ্গাড়া রেখে গেল। অনুরোধের অপেক্ষা নেই, ব্যস্তভাবে অতনু শিঙ্গাড়া তুলে নিয়ে কামড় দিল। বললে, বাঃ চমৎকার ত ? এরকম শিঙ্গাড়া আগে খাইনি।

প্রমীলা বললে, বৌদিদির হাতের তৈরি ; ডিম, বিস্কুট আর চপের মাংস,—এ ছাড়া আর কিছু নেই ওতে। খুব ভালো খেতে হয়।

পরিহাস ক'রে অতনু বললে, ভারি কুসংস্কার তোমাদের। খাওনা তুমি একটা, মিলি ? এমন চমৎকার শিঙ্গাড়া হ'তে পারে, আমি কল্পনাও করিনি। খাও তুমি—এই ব'লে সে পর-পর চার পাঁচটা শিঙ্গাড়া একে একে খেয়ে ফেললো। তার চেষ্টা, যদি কোনো সংস্কার প্রমীলার থাকে ত ভাঙুক, তার বিশ্বাস আর আদর্শ চূর্ণ হোক, নিজের কাছে নিজে সে ছোট হয়ে যাক্।—তার চোখের দুই উজ্জ্বল তারায় আবার

সেই নোংরা উল্লাস জ্ব'লে উঠলো। পুনরায় বললে, কই, খেলে না? অন্তত একটা খাও? এতদিন পরে দেখা, সামান্য একটা অনুরোধ রাখবেনা তুমি?

কৃত্রিম একটা আতিশয্য তার আগ্রহে; অনুরোধের উচ্ছ্বাসটাও যেন অতিশয় বিসদৃশ। বারান্দায় তখন কেউ কোথাও নেই। প্রমীলা শান্তকণ্ঠে বললে, তুমি জোর ক'রে হাতে দিলে আমাকে খেতেই হবে। কিন্তু তুমি যে বললে, আমি বিধবা?

অতনু মুখ তুলে তাকালো। চাঞ্চল্য তার স্থির হয়ে এলো। অপলক বিস্মিত দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে বললে, তার মানে? তুমি বিধবা নও?

বিধবা হলে তুমি খুশি হ'তে?

না।

বিয়ে না করলে খুশি হতে?

মোটেই না। বিয়ে কি তুমি করোনি? তা মন্দ নয়, এক রকম ভালোই আছো। সংসারে কোনো দায়িত্বের যন্ত্রণা নেই, লঘুপাখায় উড়ে চলা। খুব টাকাপয়সা জমাচ্ছো ত? বেশ, আমার মৃত্যুর পর আমার দেনাগুলো শোধ ক'রে দিয়ো। শুনে ভারি খুশি হলুম।—ব'লে অতনু খুব হাসতে লাগলো।

কিন্তু প্রমীলার শান্ত স্তব্ধ মুখে কোনো উৎসাহ দেখা গেল

না। সে যেন বহুক্ষণ থেকেই অতনুকে পর্যবেক্ষণ ক'রে চলেছে নির্লিপ্ত বিচারকের মতো। এমন উচ্ছ্বাসের, আতিশয্যের কোনো সাড়া নেই,—অতনু যেন বিমর্ষ হয়ে এলো, প্রদীপের তেল ফুরোলে যেমন সেটা নিবে আসে। মেয়েদের কাছে সে কখনো লজ্জিত হয় না, নারীজাতি তার হুকুমের পাত্রী,—কিন্তু তবু, এই প্রস্তর-প্রতিমার প্রশান্ত ও প্রসন্ন দৃষ্টিতে যেন তার প্রতি কেমন একটা কৃপা ফুটে রয়েছে। কৃপাটা স্পষ্ট নয়, গায়ে-পড়া নয়, তাই তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায় না,—কেবল মুখ ফিরিয়ে নিতে হয়।

অতনু বললে, ভারি চমৎকার সন্ধ্যা আজ। এদিকটা একটু ফাঁকা। তোমাদের এ অঞ্চলে বন-জঙ্গল কিছু কম দেখছি। আঃ, কী সুন্দর চাঁদের আলো।—তোমার দাদা কোথায় গেল, মিলি ?

নিশ্বাস ফেলে মিলি বললে, ওদিকে আপিস ঘরে। লোক-জনের কাছে কাজের হিসেব নিচ্ছেন। আমি রোজ এই সময়টায় ছেলেদের পড়াই।

তাহলে তোমার সময় নষ্ট করলুম, বলো ?

নষ্ট করাই ত তোমার অভ্যেস।—ওকি মুখ ফেরালে কেন ?—প্রমীলা একটু হাসলো।

অতনু বললে, মুখটা লুকোবার চেষ্টা করছি। ঠিক কোথায় লাগছে বুঝতে পাচ্ছিনে। হয়ত দোষ কিছু করিনি, কিন্তু

রেখা ফুটছে মুখে। কেন, জানিনে। নিজের ছবি যদি এখনই তুলতে পারতুম, তবে ভবিষ্যতে দেখতুম নিজেকে,—গালের আর চোখের চামড়ার নিচে ফুটেছে আমার পুরনো ইতিহাস।—কিন্তু আর আমি বসবোনা মিলি, সত্যি-সত্যিই তোমার সময় নষ্ট করবো না, এবার আমি যাই।

আচ্ছা,—ব'লে প্রমীলা তাকে অতি সহজ কণ্ঠে যাবার সম্মতি দিল। উঠে দাঁড়িয়ে অতনু বললে, প্রণবেশের সঙ্গে আর দেখা হবার দরকার নেই, তার স্ত্রীকে নমস্কার জানিয়ে ব'লো, অনেক খেয়েছি, পেট ভ'রে গেছে, খুব আনন্দ পেয়ে গেলুম।—এই ব'লে সে বারান্দা থেকে নেমে সটান এগিয়ে চললো।

গেট পর্যন্ত প্রমীলা তার সঙ্গে-সঙ্গে এলো। যতদূর দৃষ্টি চলে শরৎ-ত্রয়োদশীর জ্যোৎস্নায় সমগ্র অধিত্যকা অলকাপুরীর তন্দ্রায় যেন আতুর। প্রমীলা একটি অনুরোধ করলো না, ধ'রে রাখলো না—কেবল তার চ'লে যাওয়ার পথের একধারে এসে দাঁড়ালো। বললে, এখান থেকে তোমাদের তাঁবু এক মাইলের মধ্যে। সামনেই দু'একটা দোকান পাবে, তার পাশ দিয়ে নেমে যেয়ো। যেতে মিনিট কুড়ি লাগবে।

অতনুর দাঁড়াবার আর সাধ্য নেই। প্রমীলার নীরস নিরাসক্ত কণ্ঠস্বরে না আছে আগ্রহ, না উত্তাপ। একটা তুহিন-রোমাঞ্চে অতনুর দুই পা যেন অবশ হয়ে এলো। বললে, এই কথা জেনে রেখো মিলি, অতনু আজ কোনো উত্তর দিয়ে

যেতে পারলো না, নালিশ সঙ্গে নিয়েই সে চললো, অপরাধের কালি মুখে মেখে গেলো।—আচ্ছা, যাবার আগে আর একটা জবাব দাও। বিয়ে তুমি করোনি কেন?

প্রমীলা বললে, এতকাল পরে ও-কথা শুনতে চাও কি জন্যে?

উত্তপ্ত কণ্ঠে অতনু ব'লে উঠলো, লোভ কেবল শোনবার,—কৌতূহল। একটা জীবন নিরর্থক গেল, তারই আগাগোড়া ছবিটা মনে এঁকে নেবার বর্বর বাসনা।

প্রমীলা কয়েক পা এগিয়ে এসে বললে, মনে পড়ে, তুমি আদর্শবাদী ছিলে? আমি তখন ছাত্রী, ছায়ার মতন ঘুরেছি তোমার পেছনে পেছনে। তোমার আদর্শমতো নিজেকে গড়বার চেষ্টা করেছি এতকাল। কিন্তু বিয়ে করার কথা ত তুমি ব'লে যাওনি?

তাই তুমি বিয়ে করলে না? নিঃসঙ্গ রইলে চিরকাল?

প্রমীলার কণ্ঠস্বর ঈষৎ কাঁপলো। মৃদুকণ্ঠে সে বললে, তুমি ত' আর কোনোদিন ফিরে এলে না, অতনু।

অতনু কি যেন সহসা উচ্চারণ ক'রে দ্রুতপদে চ'লে গেল।

* * *

পরদিন সকাল থেকেই পুরন্দর সেনের শুটিং আরম্ভ। গল্পটা এবার জমেছে। ঝড় আর বিপ্লবের দৃশ্য পেয়ে পুরন্দর খুব খুশি। সামন্ত রাজধানী আর মন্দিরের দৃশ্য তোলা শেষ।

তরুণ ব্রাহ্মণ আর কমলমণির প্রণয়ের বিরুদ্ধে সামন্ত রাজা যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। নৃত্যসভা থেকে কমলমণি এক জ্যোৎস্না-রাত্রে নগর ত্যাগ ক'রে যাবেন নিরুদ্দেশে—সেই করুণ দৃশ্যটা কেবল বাকি। সেই দৃশ্যের পরিকল্পনায় অতনু সমস্ত রাত্রি ভ'রে একা বিষপান করেছে। অসাধারণ তার যকৃতের সহনশক্তি।

একটি দিনের জন্য অতনু সহসা নিজের বুকের মরুপ্রান্তরের ওপর যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দিল। সেখানে কত মরা পাখীর পালক, কত কঙ্কালের চূর্ণ অবশেষ, বিলুপ্ত ইতিহাসের ছোট ছোট অসংখ্য ভগ্নাংশ। অতনু বুক পেতে দিল, তার উপর দিয়ে ধাবমান ঝটিকাবাহিনীর মরণোৎসব চললো ছুটে। সুস্মিতার তীরে সর্বশেষ তাঁবুর মধ্যে অতনু তার প্রবৃত্তির রাশ আল্‌গা ক'রে বল্গাহীন মত্ত অশ্বের দল ছুটিয়ে দিল। একটি দিন-রাত্রির জন্য অন্তত, পুরন্দর সেন তাকে ক্ষমা করবে। পুরুষ-প্রকৃতির আদিম সমারোহ সে জাগিয়ে তুললো।

বারো বছর আগেকার পুরনো দিনের ছোট-ছোট ইতিহাসের টুকরো তাঁবুর মধ্যে চারিদিকে ছড়ানো। ক্ষয়-ক্ষতি নিরাশা-সংশয় লজ্জা-ভয়ের সেখানে ভীড়; কিন্তু সমস্তগুলি সুষমামণ্ডিত হয়েছে একখানি কমনীয় মুখের ছবিতে। সুস্মিতার মতো পরিচ্ছন্ন; কবিতা-বিলাপে সর্বদা মুখর। অতনু মুখ ফিরিয়ে সেদিনকার প্রমীলার মুকুরে নিজেরই ছবি দেখলো।

কপালে তার রেখা নেই, চোখের তারায় তীক্ষ্ণতা নেই, ওষ্ঠাধরে নেই বক্র ব্যঙ্গের বিকৃতি। চিবুকে আদর্শবাদীর দৃঢ়তা, ভঙ্গীতে তার ভবিষ্যৎ জীবনের মহিমান্বিত স্বপ্ন।

বিলোল-কম্পিত দৃষ্টিতে অতনু দেখছে একটি-একটি 'ক্লোজ-আপ'। হুগলীর সীমান্তে গঙ্গার ধারে একটি ছোট বাড়ী, চৈত্র জ্যোৎস্নায় তটপ্রান্তপ্রসারী পুষ্পোদ্যানে চন্দ্রশেখর আর শৈবলিনী, শীলঙ পাহাড়ে পাইন পাদপের নিচে বনভোজন, উমাপতিবাবুর মৃত্যুশয্যা, দাদা বৌদিদির বিলাত যাওয়া, ছাব্বিশ সালের কংগ্রেসে ভলান্টিয়ার হয়ে তাদের দেশ ত্যাগ। আরো অসংখ্য, অগণ্য স্মৃতির স্ফুলিঙ্গ। মুমূর্ষু সেই বিক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গদলের উপর কলকণ্ঠী ও বিবশা দেবদাসীদের আতপ্ত নিশ্বাস সেগুলোকে মাঝে মাঝে উজ্জ্বল ক'রে তুলছে। অতনুর কাছে এমন অনর্গল প্রশ্রয় তারা আর কখনো পায়নি। বীণাবতী আর মাধুরীলতা, মালতী আর হৈমবতী—ওদের অবরুদ্ধ আশা আর ঔৎসুক্য এই অনর্গলতায় আপন আপন ঘট ভ'রে নিল। কঠোর তপস্যায় যাকে পাওয়া যায়নি, তার এই অবারিত আত্মসমর্পণে ভাগাড়ের শকুনিরা কোলাহলমুখর হয়ে উঠেছে।

অর্দ্ধ অচেতন অতনু তার মনের ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে একবার ওদের 'ক্লোজ আপ' নিল।

মধ্যাহ্ন গড়িয়ে গেল অপরাহ্ণে। কোন্ নিরুদ্দিষ্ট জলাশয়ের

দিক থেকে বনহংসের দল উড়ে চললো আকাশ মুখর ক'রে পর্বতশিখর দিয়ে। চতুর্দশী ক্ষয় হয়ে পূর্ণিমার চন্দ্র দেখা দিল পূর্ব গগনে। উপত্যকা হোলো গোধূলির সংশয়ে ধূসর ; সুস্মিতার পাংশুল স্বর্ণাঞ্চলে রূপার পালিশ দেখা গেল।

পুরন্দর লোক পাঠিয়ে সংবাদ নিলেন। কিন্তু তাঁবুর পর্দা সরাতে সাংবাদিকের ভরসা হোলো না। ভিতরে রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ তখনো নিমজ্জিত। আজকে সেই সমারোহ সমাপ্ত হবার কোনো আশা নেই। পুরন্দর প্রমাদ গণলেন। দেবদাসী নৃত্য আজো বুঝি পণ্ড হয়। অবশেষে অস্থির হয়ে তিনি নিজেই এসে হাজির হলেন। পর্দার বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, অতনু, অতনু ?

অতনু স্খলিতকণ্ঠে সাড়া দিল, হুজুর ?

ভেতরে আসতে পারি একবার ?

না। ভদ্রপুরুষের পক্ষে অসুবিধা আছে।

পুরন্দর বললেন, কিন্তু এ বেলাকার শুটিংটা যে সারতেই হবে ভাই ? আজ পূর্ণিমায় ভারি সুন্দর ছবি উঠতে পারতো।

অতনু আর্তকণ্ঠে বললে, মাসখানেক অপেক্ষা করুন, আর একটা পূর্ণিমা পাওয়া যাবে।

পুরন্দর স্বগতোক্তি করলেন, তাহলে আমার চাকরি যাবে।

গত রাত থেকেই অতনুর ভিতরকার অবাধ্য শিল্পী অসহযোগ করেছে। একমাত্র সেই এখন পারে এই

কোম্পানীকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করতে, আর কেউ না। আজ অতনুর বাঁধ ভেঙেছে, বান ডেকেছে। প্রতিভা যদি প্রবৃত্তির নিচের স্তরে নামে, সে আত্মঘাতী; সরীসৃপের মতো সে ভয়ঙ্কর, শ্বাপদের অপেক্ষাও হিংস্র। আগ্নেয়গিরি থেকে আগুন উঠে আকাশকে আলোকিত করে, নিজের বুকের উপর ছড়ায় অগ্নিস্রাব, দগ্ধ করে আপন সর্বাঙ্গ।

পুরন্দরের মাথায় বৈষয়িক বুদ্ধি এলো। একটা কৌশল করলে কোম্পানীর যৎকিঞ্চিৎ ক্ষতি হ'তে পারে, কিন্তু বাঁচবে অনেক বেশি। তিনি গলা বাড়িয়ে পুনরায় ডাকলেন, অতনু?

আজ্ঞে?

ছবি তোলার বদলে আজ অভিনয় করবে তুমি?

অভিনয় করছি অনেকক্ষণ থেকে, মিস্টার সেন।

পুরন্দর বললেন, না হে না, ওসব নয়। আজকে তুমি যদি রাজার পার্ট করো খুব ভালো হয়। দেবদাসীর নৃত্য-সভায় সামন্ত রাজার বিলাস,—পারবে? আমি তোমার য়্যাসিস্ট্যাণ্টকে দিয়ে ছবি তুলিয়ে নেবো।

এ ব্যবস্থা সম্ভব কিনা অতনুর চিন্তা করার দরকার নেই, কিন্তু সে রাজার ভূমিকায় নেমে অভিনয় করবে এই উল্লাসে লাফিয়ে উঠলো। চেঁচামেচি ক'রে উঠে আসর ভেঙে লণ্ডভণ্ড ক'রে সে কোলাহল জাগিয়ে তুললো। বললে, খুব পারবো

স্যার,—আমাকে সাজিয়ে দেওয়া হোক, ক্যামেরা প্রস্তুত করুন।—এই ব'লে সে বেরিয়ে এলো।

পুরন্দর বললেন, বাঃ, চমৎকার আজ তোমাকে মানাবে, অতনু। তোমার সমস্ত ভঙ্গীতে পাওয়া যাচ্ছে রাজকীয় অভিমান।

পুরন্দরের হাত ধ'রে অতনু জড়িতকণ্ঠে বললে, বলুন মিস্টার সেন। আর কিছু না হোক, রাজার পার্ট আমি শিশির ভাদুড়ীকেও শেখাতে পারতুম। After all, I am a genius. আমি অভিনয় করলে, দেখবেন, কোম্পানী প্রচুর টাকা পিটবে। দিন্ ত সাজিয়ে আমাকে? আমি কি সামান্য ক্যামেরাম্যান!

তাঁবুর পর্দার পাশেই ক্যামেরা বসানো হোলো। বীণাবতী আর মঞ্জুশ্রী হেসে হেসে অতনুকে রাজবেশ পরাতে লাগলো। জরি আর মখমলের সজ্জা, মুক্তার অলঙ্কার, মাথায় মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, চোখে কাজল, কোষে তরবারি, পায়ে নাগরা।

এমন সময় প্রহরী এসে সংবাদ দিল, জনৈক নগরবাসিনী রাজার দর্শনপ্রার্থী।

অতনু বললে, কে?

সে বললে, নাম বলেননি।

মঞ্জুশ্রী আর বীণাবতীর কাঁধে ভর দিয়ে রাজবেশ পরা অতনু তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো। পূর্ণিমার ঘন জ্যোৎস্নায়

প্রমীলাকে চিনতে তার দেরি হোলোনা। প্রমীলা তাকে নিরীক্ষণ ক'রে চিনতে পারলো, তার মত্ত অবস্থা দেখে শিউরে উঠলো, এবং তার সর্বাঙ্গ থেকে উৎকট গন্ধ পেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো।

অতনু জড়িত কণ্ঠে বললে, আরে, মিলি? তুমি যে এলে আবার এমন সময়ে?—মেয়েদুটির কাঁধ ছেড়ে দিয়ে অতনু স'রে এলো।

ভীরু প্রমীলার দুই পা কাঁপছে। নরককুণ্ডের বিভীষিকার দরজায় যেন সে ভুল ক'রে এসে পড়েছে। তবু শান্ত কোমল কণ্ঠে সে বললে, কাল আমাদের ওখানে জামাগুলো ফেলে এসেছিলে, সেগুলো এনেছি। আর বৌদিদি এইগুলো—

কে শোনে কা'র কথা! ঝড়ের মতো অতনু হেসে উঠলো, বারুদের স্তূপ থেকে যেমন আগুন ফেটে পড়ে। হেসে টলটল ক'রে অতনু সহসা প্রমীলার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, মিলি, আজ তোমাকে পেয়ে আমি ধন্য। রাজার অভিনয় দেখে যাও—কই, কোথায় তোমরা—?

অপরিচিত স্ত্রীপুরুষের মাঝখানে এই কদর্য ব্যবহার—প্রমীলাকে একটা রূঢ় আঘাত দিল। সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে কাগজের এক ঠোঙ্গা গরম শিঙ্গাড়া মাটিতে প'ড়ে ছড়িয়ে গেল। অসংযত বর্বরের হাত থেকে মুক্তি নিয়ে সে পালাবার চেষ্টা করলো।

টলতে টলতে অতনু বললে, কি হলো ? ধরো, আমি যদি রাজা হতুম, তুমি হ'তে পারতে—

দূরে স'রে গিয়ে প্রমীলা রুদ্ধ রোষে, ক্ষোভে, অপমানে গর্জন ক'রে বললে, এই তুমি, অতনু ? মরতে পারোনি কেন ? মাতাল, চরিত্রহীন, জানোয়ার—

নিমেষমাত্র, তারপরেই অতনু হেসে উঠলো। প্রমীলা একটি মুহূর্তও আর অপেক্ষা করলো না, দুই হাতে কান্না ঢেকে যে-পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথেই চাকরটাকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে চলতে লাগলো।

সন্ধ্যারাত পূর্ণিমায় উদ্বেলিত। প্রমীলার চ'লে যাওয়ার দিকে চেয়ে সহসা অতনু তার সর্বাঙ্গের রাজবেশ টেনে ফেলে দিল, ছিঁড়ে ফেললো মুক্তার মালা। তারপর চক্ষের পলকে ক্যামেরার কাছে গিয়ে লেন্সের মুখটা ঘোরালো প্রমীলার পথের দিকে। প্রান্তরের জ্যোৎস্নায় অদৃশ্যমানা প্রেতিনীর আর্তস্বর তখনো এক একবার ফুঁপিয়ে উঠছিল।

জ্বলজ্বলে তীক্ষ্ণ একটি চক্ষু সূচিকার মতো ক্যামেরার ছিদ্রে প্রবেশ করিয়ে অতনু চেঁচিয়ে উঠলো। বললে, পেয়েছি, পেয়েছি, মিস্টার সেন, অপমানিত কমলমণি চলেছে নিরুদ্দেশে, তার একটা 'লং শট্'। একটা রোমান্টিক ব্যর্থতা······ চমৎকার।

মেয়েপুরুষের দল স্তব্ধ বিস্ময়ে অতনুকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল।

ঐতিহাসিক

শিমলা পাহাড়ে সরকারী আসর সবেমাত্র ভেঙেছে। অক্টোবরের মাঝামাঝি। দেখতে দেখতে শীত প'ড়ে গেল।

চাক্‌রী উপলক্ষ্যে স্থায়ী বাসিন্দা যারা, সরকারী দপ্তরের সঙ্গে তারা দিল্লী নেমে গেছে, আর যারা অস্থায়ী অথবা নবাগত তারা বাসাছাড়া পাখীর মতো এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত। বন্ধুবান্ধব অথবা দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়রা ওদের ঘাড় থেকে নামিয়ে হাঁপ ছেড়ে পালিয়েছে। ওদের মধ্যে যারা স্বাস্থ্যান্বেষী তারা সস্তায় কোনো কোনো পাঞ্জাবী হোটেলে মাথা গুঁজে রয়েছে। ভারি অসুবিধা।

পূজোর ছুটিতে ভবানীপুরের একটি বাঙ্গালী দল দিল্লী থেকে এখানে ঘুরে যেতে এসেছিল। তারাও ফিরে যাবে, অক্টোবরের শীত সহ্য করা নাকি তাদের পক্ষে কষ্টকর। কিন্তু এখানে নিতান্তই অন্ন-অজীর্ণের অভাব ব'লে যাই যাই ক'রেও এ-সপ্তাহে তাদের যাবার উৎসাহ হয়নি।

নিরুৎসাহের কারণটা এখানে অনেকেই অনুভব করে সরকারী দপ্তরের সুবিধা অসুবিধায় যাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই সব চাকুরেদের কাছে শরৎপ্রকৃতির ঐশ্বর্য সম্ভার খুব বেশি দামী নয়। বর্ষার পরে আর সব পাহাড়ী শহরের মতো শিমলাতেও এই সময়ে রাশি রাশি মরশুমী ফুল ফুটে ওঠে। লোক-সমারোহ নিচে নেমে যাবার পর শিমলা যেন ঘোমটা খুলে সুন্দর হাসিমুখে পথে পথে বেরিয়ে পড়ে। অবশিষ্ট যারা থাকে তারা এই অলকাপুরী সহজে ছেড়ে যেতে চায় না।

গাছের ছায়ায় ব'সে দুপুর বেলাকার চায়ের আসরে কথায়-কথায় ললিতবাবু বললেন, তা হ'লে আমাদের যাওয়া কবে স্থির হোলো হে, তপেন্দ্র ?

তপেনবাবুর হয়ে সুরমা দেবী জবাব দিলেন। অনুযোগ ক'রে বললেন, চড়িভাতির প্রস্তাবটা বুঝি ধামা চাপা পড়লো ? —ব'লে তিনি তাঁর কপালের দুদিকে কোঁকড়ানো পাকা চুলের উপর ঘোমটা টেনে দিলেন।

ওঃ তুমি এখনো ভোলোনি দেখছি—ললিতবাবু বললেন, বেশ ত, ছোট শিমলার দিকে অন্য একটা জায়গা ঠিক করো, আমার আপত্তি কি !

তপেনবাবু বললেন, প্রস্পেক্ট্ পাহাড় নাকচ করা হোলো কেন ?

জিজ্ঞেসা করো তোমার স্ত্রীকে—ব'লে ললিতবাবু তামাকের পাইপটা ধরালেন।

তাঁর এই ছদ্মগাম্ভীর্যে সুরমা দেবী চোখ পাকিয়ে হেসে বললেন, একটুও চক্ষু লজ্জা নেই আপনার, রায় সাহেব। ওগো শুনেছ, সেখানে গেলে নাকি আমার কান্না পাবে।

তপেনবাবু হেসে বললেন, কেন?

নিশ্বাস ফেলে পঞ্চাশোর্ধ্ব ললিতবাবু বললেন, সেসব অনেক কথা ভাই,—প্রায় তিরিশ বছর আগেকার ঘটনা। তখন তুমি কোথায়! আহা, সব খুলেই বলো না, সুরমা।

সুরমা রাগ ক'রে গলা নামিয়ে বললেন, ছেলেরা এদিকে রয়েছে, আপনার যদি একটুও কাণ্ডজ্ঞান থাকে। ওগো, সেই যে তোমাকে বলেছিলুম, ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ এই শিমলেয়, সেই কথা খোঁচা দিয়ে উনি শুনতে চান।

তপেনবাবু বিস্ফারিত হাসি হেসে কৌতুক ক'রে বললেন, বলো কি, প্রণয়কাণ্ড? তিরিশ বছর আগেও এসব ছিল নাকি?

ললিতবাবু হাসিমুখে বললেন, মহাভারতের যুগ থেকেই আছে ভাই। আচ্ছা বড়বৌ, তোমার বাক্সে বোধ হয় সুরমার এক আধখানা চিঠি এখনো পাওয়া যায়, কি বলো?

শোভনা দেবী বললেন, আ, তোমার এক কথা!

সুরমা বললেন, চুল পেকে মাথা যে শাদা হ'য়ে এলো

আপনার, এখনো ওই সব ? আমার বয়স কত হোলো খবর রাখেন ?

জানিনে ?—ললিতবাবু বললেন, জপের মালার মতন একটি একটি ক'রে গুণ্‌ছি। প্রায় পঞ্চাশ হয়ে এলো।

তবে ?

তপেনবাবু বললেন, আহা চটো কেন গো, ফল পাক্‌লে রস মিষ্টি হয়।

উচ্চ হাসিতে বাগানের চায়ের আসর মুখরিত হয়ে উঠলো। সে-হাসিতে তিরিশ বছর আগেকার মাত্রাজ্ঞানহীন বন্যা নেই, নিকট বার্ধক্যের হিসাব করা মানানসই হাসি। একথা উপস্থিত সকলের কাছেই স্পষ্ট, অবসর বিনোদন ভিন্ন এ জাতীয় আলাপের আর কোনো অর্থ নেই,—এই রসিকতার নিগূঢ় ইতিহাস পর্যালোচনা করাও একটা অহেতুক নির্বুদ্ধিতা। তবু সময় কাটাতে হবে। রায় সাহেব ললিতচন্দ্র পেন্‌সন্ নিয়েছেন। একমাত্র কন্যার বিবাহ হয়ে গেছে। ছেলেটি বিলাতে পড়াশুনো করে। তপেনবাবু এসেছেন স্বাস্থ্য ফেরাতে, স্ত্রী স্বরমার অজীর্ণের ব্যারাম। তাঁর এক ছেলে আর দুই মেয়ে সঙ্গেই এসেছে। দেশে ফিরে গিয়ে আবার প্রকাণ্ড সংসারের বোঝা কাঁধে তুলে নিতে হবে। যে ক'দিন বিশ্রাম পাওয়া যায় সেই ক'দিনই স্বস্তি। যাবার পথে তাঁরা এলাহা-বাদে নামবেন ; দ্বিতীয়া কন্যার জন্য সেখানে একটি পাত্রের

সন্ধান আছে। ললিতবাবু দিল্লীতে নেমে তাঁর বিলাত-প্রবাসী পুত্রের জন্য একটি সরকারী চাকরির তদ্বির করে যাবেন। তাঁর ছেলের ফিরবার সময় হয়েছে।

এমন সময় একটি কৃশকায় কৃষ্ণাঙ্গ সাহেব উপরের ম্যাল্ থেকে তাঁদের লন্এর দিকে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে নেমে এলেন। চোখে টেপা-চশমা, মুখে সিগারেট। নাম মণিমোহন।

—কি হে ব্যাচিলর, বেরিয়েছ সেই সকাল আটটায়, এখন বেলা তিনটে বাজে। ছিলে কোথায় ?

ব্যাচিলর এসে বেতের একখানা চেয়ার নিয়ে বসলেন। বললেন, ঘুরে বেড়াতে হয় হে, এটা পাহাড়ী দেশ। ব'সে ব'সে দিনরাত আড্ডা দিলে শরীরও ভালো হয় না, বাতেও ধরে। খুব বেশি ক'রে হাঁটতে' হয় এখানে।

ললিতবাবু বললেন, হাঁটাটাই ত অসভ্যতা। যদি হাঁটতেই হয়, তবে কল্কাতা কি দোষ করলে ? হাঁটাহাঁটি করলে কল্-কাতাতেও হজম হয়, শিমলের জল হাওয়াটা দেখি না, কেমন। তুমি এতক্ষণ কোন্ ঘাটে জল খাচ্ছিলে শুনি ?

ব্যাচিলর বললেন, তারা দেবীতে।

একা ?

সিগারেটটা টেনে মণিমোহন বললেন, ব্যাচিলররা কি কখনো একা থাকে হে ?

সুরমা-শোভনা প্রমুখ সবাই হেসে উঠলেন। মণিমোহন বললেন, বেশি তাতিয়ো না। বুড়ো হয়েছি, মুখের বাঁধ এখন আল্‌গা। তোমরা স্বামীস্ত্রীর দল ঘরকন্নার আলাপ নিয়ে আছো দিনরাত, আমি তার মাঝখানে হংস মধ্যে বকো যথা। আজকাল ধৈর্যচ্যুতি হয়। বেঙাচিরা বড় হলেই তাদের ল্যাজ খসে, তোমরা ল্যাজের ডগায় আবার সেই গাঁটছড়া বেঁধে নিয়ে এসেছ। ধন্য!

শোভনা বললেন, না খেয়ে রইলেন সারাদিন?

কী বলেন, মিসেস মিত্র। এক মুঠো ভাত না খেলে বুঝি আর খাওয়াই হোলো না? সে বান্দা নই। এক রাশ চপ কাট্‌লেট্‌ পেটের মধ্যে গজগজ করছে।

বলো কি?—তপেনবাবু বললেন, তাহলে তারাদেবীতে, না ওয়েগ্‌নারে? চোখের চেহারাও ত ভালো নয় দেখছি।

হাসিমুখে মণিমোহন বললেন, পরস্ত্রীরা এখানে রয়েছেন, আস্তে কথা বলো। এখন আর ভাদ্রের ভরা নদী নই, যাকে বলে প্রাচীন সরোবর। তিরিশ বছর কেটে গেল এই শিমলেয়। জানি বাকি কটা দিন এই ক'রেই কাটবে। এখানকার শ্মশানটা তোমরা দেখোনি, কিন্তু আমি যেদিন সেখানে ম্যাজিক দেখাবো, আশা করি তোমরা থাকবে।—এই ব'লে সিগারেটে তিনি আর একটা সুদীর্ঘ টান দিলেন।

সুরমা বললেন, ম্যাজিকটা কি, মণিবাবু?

ম্যাজিক হোলো ডিগবাজি।—ধোঁয়া ছেড়ে মণিমোহন বললেন, জীবনটাকে কিক্ ক'রে চ'লে যাবো, আর শরীরটা প'ড়ে থাকবে ঈশ্বরের দিকে মুখ খিঁচিয়ে। হার মানিনি কোথাও; সম্মুখ-যুদ্ধে ঈশ্বরকেও কাৎ করেছি এই সান্ত্বনা। সংসারের সবচেয়ে ভালো যা, আদায় ক'রে নিয়েছি; যা মন্দ তাই রেখে গেলুম পাঁচজনের জন্যে।

মন্দটা কি?

অসার খলু সংসারঃ। শঙ্কর যাকে বল্‌ছেন, মায়া।

ললিতবাবু হাসিমুখে বললেন, কিন্তু মরতে যে তোমার এখনো অনেক দেরি, ব্যাচিলর।

নিশ্চয়ই।—মণিমোহন বললেন, সবেমাত্র পঞ্চান্ন, এখনো পঁচিশ বছর। সবাই বলে, ব্যাচিলর বেশি দিন বাঁচে না। ফুল্‌স্! বাঁচবার আর্ট জানি আমরা। আমরা ধীরে-সুস্থে খরচ করি, তোমাদের মতন বাজে খরচ করিনে।

কিন্তু তোমার যে কাহিল শরীর।

ড্যাম্ ইট্। চর্বির পিণ্ড ত নই। বাঁশ যতই মোটা হোক, ঘুণ ধরে; লোহার শিকে মর্চে ধরলেও কঠিন। মচ্‌কাবো, ভাঙবো না।

কিন্তু আসল কথাটা ত' বললে না, ব্যাচিলর।

মণিমোহন সরল হাসিমুখে বললেন, শুনতে চাও? ওয়েগনার হয়ে তারাদেবীতে।

সঙ্গে ?

ফস ক'রে পুনরায় মণিমোহন চ'টে উঠলেন। বললেন, ভদ্রমহিলাদের সামনে আমাকে অপ্রস্তুত করতে চাও তোমরা ?

সুরমা বললেন, আঃ কেন তোমরা সবাই মিলে ওঁকে বিরক্ত করছো বলো ত ? মানুষ কখনো একা তিরিশ বছর কাটাতে পারে ?

মণিমোহন উত্তেজিত হয়ে বললেন, বলুন ত, সুরমা দেবী সত্যি কথাটা ? মনে পড়ে, ললিত আমাকে পঁচিশ বছর আগেও এই নিয়ে ক্ষেপাতো ?

সুরমা বললেন, সব মনে আছে, মিষ্টার চৌধুরী।

সবাই হো হো ক'রে হেসে উঠলো। হাসির অর্থটা সহসা অনুধাবন ক'রে হাতের সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে মণিমোহন বললেন, ইউ ওল্ড্ ভাল্চার্স !—ব'লে উঠে দাঁড়িয়ে ছড়ি ঘুরিয়ে অগ্রসর হলেন।

শোভনা তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, যাবেন না, মিষ্টার চৌধুরী। আমাদের একটা ফিষ্টের বন্দোবস্ত হচ্ছে। আপনি সঙ্গী হবেন ত ? যাবার আগে একটু আনন্দ ক'রে যাবো সবাই।

ফিরে দাঁড়িয়ে মণিমোহন বললেন, নিশ্চয়ই, কবে ?

আপনিই একটা তারিখ ঠিক করুন না ?

ছড়িটায় ভর দিয়ে ডান পা নাচিয়ে মণিমোহন বললেন, আগামী শনিবারে নয় কিন্তু, আমি অন্যত্র বন্দী।

পাইপটা টেনে ললিতবাবু বললেন, বুঝলুম। তাহ'লে রবিবার। সকাল থেকেই ঝোলাঝুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাবে।

অতি উত্তম। ফীস্টটা হচ্ছে কোথায় ?

সুরমা বললেন, প্রস্‌পেক্টে।

প্রস্‌পেক্টে।—মণিমোহন বললেন, ওঃ কদ্দিনের কথা! বছর তিরিশ প্রায় হবে। মনে পড়ে ললিত, সুরমাদেবীরা ছিলেন ? বৃষ্টিতে ভেজা কড়াই শুঁটির খিঁচুড়ি খাওয়া হয়েছিল। তখন, যতদূর মনে পড়ে, সুরমার বিয়ে হয়নি।

তপেনবাবু বললেন, দেখা যাচ্ছে সেকালে আমার স্ত্রীটিই ছিলেন প্রধানা নায়িকা।

সুরমা বললেন, আঃ থামো তুমি বাপু। বুড়ো হয়ে মরতে চললুম।

মণিমোহন বললেন, না হে না, অত গৌরব স্ত্রীর জন্যে নিয়ো না। সবসুদ্ধ মেয়েপুরুষে ছিলুম আমরা কুড়ি বাইশ জন। কী হুল্লোড় সারাদিন।

সুরমা বললেন, রায় সাহেবের বোনেরাও ছিলেন সেদিন আমাদের সঙ্গে।

ললিতবাবু এইবার শান্তকণ্ঠে বললেন, অমলের কথা মনে পড়ে ব্যাচিলর ? ওই প্রস্‌পেক্টেই ত আশালতার সঙ্গে তার ভাব, তার পর বিয়ে। এক বছর না যেতেই বেচারা অমলের অকাল মৃত্যু।

আর তোমার গিয়ে সেই মিস 'ডলি চক্রবর্তী। জানো তার কথা ?

ললিতবাবু বহুকালের পুরাতন স্মৃতির কথা মনে করলেন। এই কণ্ঠস্বরেই তাঁর বার্ধক্য আত্মপ্রকাশ করলো। বললেন, থাক্, তপনের ছেলেমেয়েরা রয়েছে ওখানে। জানি তার কথা। ইউরোপীয়ন কোয়াটারে ফ্ল্যাট্ ভাড়া নিয়ে থাকে একা, নেশাভাঙও ক'রে শুনেছি।

শোভনা দেবী বললেন, ধন্য প্রসপেক্ট,—তোমাদের সকলের ভাগ্যনিয়ন্তা!

সুরমা বললেন, সেই জন্যেই আর একবার দেখতে ইচ্ছে করে।

* * *

বহুকাল অতীত, তবু স্বপ্নের মতো সেকালের কথা মনে পড়ে। বায়লুগঞ্জের পথঘাটের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। আগে তীব্বতীরা এখানে মেলা বসাতো। লোমের কম্বল, নীল মুক্তো, চীনা পুতুল, হাড়ের মালা, পাহাড়ী টোট্কা—এই সব বিক্রী করতে আসতো। কম্বলের চপ্‌লি পাওয়া যেতো খুব সস্তায়, দামী পাথর নামমাত্র মূল্যে পাওয়া যেতো। কিন্তু আজ সেখানে প্রকাণ্ড বাজার, দিল্লী আর শিমলা থেকে সরাসরি মাল আমদানী-রপ্তানি হয়। কাঁচা তামাক আর চরসের বদলে

আজকাল পাওয়া যায় বিলেতী সিগারেট আর চকোলেট। সেকাল কেটে গেছে।

কিন্তু প্রস্‌পেক্টের পরিবর্তন দৃশ্যগোচর নয়। সেই সমতল তৃণাচ্ছাদিত অধিত্যকা; পূর্বদিকে কিছু ঢালু অংশ। বড় পাথরের পিণ্ডগুলো তেমনি অক্ষয়, তেমনি কঠিন। অনেক নিচে কার্ট রোড, ত্রিশ বছর আগে সে রাস্তার এতটা উন্নতি হয়নি। বন-জঙ্গলও আগেকার চেয়ে কৃশকায়।

তবু কেমন একটা অক্ষয়, অব্যয় পরিবেশ। প্রাচীন ছায়াময় শৈবালাচ্ছন্ন শিকড়গুলি মাটির ভিতর থেকে গাছের গা জড়িয়ে তেমনিই ওঠবার চেষ্টা করছে। পত্রপল্লবের আলো-ছায়ায় শরতের আকাশের সেই রহস্যজাল সৃষ্টি, আর নামহারা বনস্পতির মর্মরে সেই প্রাচীন যুগের নিশ্বাস। ওঁদের মুখে আজ আর কথা নেই।

সুরমা দেবী একা একা অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আজ সমস্তটা তাঁর ভালো লাগছে কিনা বলা কঠিন, হয়ত সেই নির্ঘাত নিষ্কলঙ্ক কৌমার্যের কথা স্মরণ করে কেমন একটা অহেতুক ব্যর্থতাবোধের অনুভূতিতে যন্ত্রণাও বোধ করছেন—তবু শৈশব-স্মৃতির আত্মীয়তা আজ তাঁর নিবিড় করে ভালো লাগছে।

তাঁদের দলটি নেহাৎ কম নয়। তিনি, শোভনা, তাঁর মেয়ে অনিলা আর সুনীলা, ছেলে রতীন্দ্র এবং তার নবলব্ধ বন্ধু কেশব। এদিকে ললিতবাবু, তপেনবাবু, ব্যাচিলর এবং তিন

জন চাকর। মোট বারোজন। এর মধ্যে ঘণ্টা দুই পরে তপেনবাবুর এক উকীল বন্ধু পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী এসে হাজির হয়েছিলেন। তিনি তপেনবাবুর সঙ্গে বৈষয়িক আলাপে একেবারে মশগুল।

গাছের ছায়ায় পুরু কম্বলের আসর পাতা হয়েছিল। সেখানে গড়গড়ায় তামাক ধরিয়ে ললিতবাবু আর মণিমোহন বেশ গুছিয়ে বসলেন। ভিজামাটি আর গাছের বন্য গন্ধে আগেকার সেই তরুণ যৌবনের কথা মনে পড়ে। সেদিনকার সেই দুরন্তপনার স্মৃতি আজকের অবসাদ আর বিষাদে জড়ানো। কিন্তু এই বিষাদের কোনো অর্থ নেই। তাঁদের জীবনে কত ঝরে গেছে, কত নতুন সৃষ্টি হয়েছে। সংসার সন্তান-সন্ততি, ভোগের নানাবিধ উপকরণ, অর্থ উপার্জন, বৈষয়িক চিন্তা—সমস্তগুলো ঘিরে প্রকাণ্ড মহীরুহের পত্তন ঘটেছে। কবেকার কোন্ একটি দিনে তাঁদের এখানে বন-ভোজন উপলক্ষ্যে আসা কেই বা মনে রেখেছিল? শিমলায় না এলে প্রস্পেক্টের কথা কোনোকালে তাঁদের মনেও পড়তো না। ললিতবাবু আড় হয়ে শুয়ে গড়গড়া টানছিলেন একমনে, আর ছেলেমেয়েদের দিকে চেয়ে ভাবছিলেন, ওরাও একদিন পঁচিশ ত্রিশ বছর পেরিয়ে চলে যাবে, সেদিনকার নিশ্বাস ওরাও চাপতে পারবে না। ওরাও আকাশের পশ্চিম প্রান্তে নেমে পূর্বপ্রান্তের দিকে চেয়ে বিষণ্ণ হয়ে উঠবে।

শোভনা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে সুরমা অনেকক্ষণ ঘোরাফেরা করে ক্লান্ত হয়ে এসে বসলেন। দেখলেন, যে-মণিমোহন এত চঞ্চল, এত মুখর, তিনি চিৎ হয়ে শুয়ে স্তব্ধভাবে আকাশের দিকে একাগ্র তাকিয়ে রয়েছেন, সকলের মুখ থেকেই যেন সব কথা সহসা ফুরিয়ে গেছে, সুরমা অন্যমনা হয়ে রইলেন।

শোভনা দেবী হাসিমুখে বলিলেন, ব্যাচিলর সাহেব কার কথা ভাবছেন?

ভাবছি?—বলে মণিমোহন মাথা ঘোরালেন। বললেন, ভাবছিনে কিছু, মিসেস মিত্র। একটা কথা অবশ্য ভাবছিলুম। প্রথম যখন ললিতদের সঙ্গে এই প্রস্‌পেক্টে আসি—সুরমা দেবীরাও ছিলেন—তখন আমার মাইনে ছিল তিরিশ টাকা। অল্প উপার্জন বলে সেদিন বিয়ে করতে সাহস করিনি। সে-সাহস আজও নেই মিসেস মিত্র—কিন্তু আজ প্রায় হাজার টাকা আমার রোজগার। আজও মনে হয় যদি বিয়ে করি তাহলে হয়ত খরচ চালাতে পারবো না।

কথাটায় অদ্ভুত একটা নিরাশা ছিল, তার কারুণ্যের স্পর্শটা কাণে লাগে। শোভনা অল্প একটুখানি হাসলেন। হেসে বললেন, ভাগ্যের একটা চক্রান্ত কি আপনি মানেন না? নিজের ওপর যারা সমস্ত দায়িত্ব তুলে নেবার কথা ভাবে, তারা জঞ্জালের স্তূপে চাপা পড়ে, শান্তি পায়না কোনোকালে, মণিবাবু।

স্ত্রীর মুখে এমন কথাটা ললিতবাবুর কানে নতুন বলে মনে হোলো। তিনি গড়গড়া থেকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, মিথ্যে নয়। সংসারে যারা হাল্কা হতে পারেনি, বাজে কাজেই তারা নিজেকে খরচ করে। তুমি কি নিয়ে জীবন কাটালে ব্যাচিলর, বলতে পারো ?

মণিমোহন বললেন, বলতে হয়ত পারি, কিন্তু বলতে গেলে হিসেব দিতে পারবো না। চাকুরি ছাড়া দরকারি কাজ আর কোথাও কিছু ছিল না, কিন্তু তবু। প্রত্যহ আমি ছিলুম নানা কাজে ব্যস্ত, আমার সময় ছিল না। আজ, আজ তলিয়ে ভাবতে গেলে হয়ত বুঝতে পারি, সমস্তটাই খেলা, অদ্ভুত খেলা—এ খেলার আদিও নেই, অন্তও নেই। প্রকাণ্ড নির্বুদ্ধিতার ইতিহাস পেছনে পড়ে রয়েছে।

অনুশোচনা হয়না তোমার ?

না, কারণ ওর ধার ধারিনে। ষোল আনা আয় ব্যয় আমার ঠিক আছে। ধার দিইনি, ধার করিনি। নির্ভুল পথে চিরকাল চলেছি, অনুতাপ করবার কোথাও কিছু নেই, রায়-সাহেব।

ললিতবাবু বললেন, কিন্তু যাবার সময় যদি একথা মনে হয়, অন্তত কিছু ধার দিয়েও গেলে একটু আনন্দে যাওয়া যেতো ?

ব্যাচিলর বললেন, হয়ত মনে হবে, হয়ত হবে না। কিন্তু

নিজের পরিতৃপ্তি ছাড়া জীবনের আর ত কোনো অর্থ নেই। মরবার সময় মানুষ যে কাঁদে মায়াপাশ ছিন্ন করার ব্যথায়, সে কি ঠিক? মনে হয়, কাঁদে অনুতাপে, নিজেকে উত্তীর্ণ হয়ে আর কিছু সে ভাবেনি সেই ব্যর্থতায়। সেই কারণে মৃত্যু-শয্যায় ঈশ্বরের নাম করে সে ভয়ে।

তপেনবাবু একবার এসে স্নুরমার কাছে ঘুরে গেলেন। চাকরেরা পাথর কুড়িয়ে উনুন গড়ে রান্নার আয়োজন করতে লেগেছে। সকলে মণিমোহনের বাড়ীর অতিথি, সুতরাং রান্নার নির্দেশ তিনিই দেবেন। আহারের আয়োজনটা অবশ্য গণতান্ত্রিক রুচিতে প্রস্তুত হয়েছে। ললিতবাবুর ছেলেমেয়েরা হয়ে উঠেছে তরুণ-তরুণী, সুতরাং বৃদ্ধদের এড়িয়ে তারা দূরে গিয়ে গাছের ছায়ায় বসে তাসখেলায় মত্ত। কেশব ওদের অনাত্মীয় বন্ধু। ললিতবাবু ওদের সকলের দিকে তাকিয়ে রহস্যময় মৃদু হাসি হাসছিলেন। শোভনা এক সময় বললেন, ছেলেমেয়েকে তুমি ভারি আস্কারা দাও!

ললিতবাবু বললেন, আমরাও ত একদিন আস্কারা পেয়েছিলুম, বড়বউ। এই ত সুরমা বসে—জিজ্ঞেস করো ত?

নিজের নামোল্লেখ কানে যেতেই সুরমা মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে হাসলেন। বললেন, এতক্ষণে আপনার মুখ খুললো বুঝি? আমরা কী আস্কারা পেয়েছিলুম বলুন না?

আহা, বোস-গিন্নী, রাগ করলে কি আর এ বয়সে মানায়?

তোমাকে দেখলে সেযুগে আমার বুকে ঢেঁকির পাট পড়তো, বলো মিথ্যে ?

সুরমা মুখে হাত চাপা দিয়ে হেসে উঠলেন, ওমা, আমি তা কেমন করে জানবো ?

ললিতবাবু সবাইকে শুনিয়ে পরিহাস করে বললেন, যতদূর মনে পড়ে এই প্রস্পেক্টে তোমার কানে যেন দুটো মন্তরও পড়েছিলুম। নয় ?

মনে আছে।—সুরমা বললেন, সেজন্যে মামাদের কাছে আপনি কানমলা খেয়েছিলেন তাও ভুলিনি।

মণিমোহন আর শোভনা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। সুরমা বললেন, প্রথম যুগে যারা সামাজিক অপরাধ করে, শেষ যুগে গিয়ে তারা পায় সরকারী খেতাব। যেমন আপনি।

আচ্ছা, সত্যি করে বলো দেখি—ললিতবাবু সোজা হয়ে বসে বললেন, শেষকালে দেবীর দয়া হয়েছিল কিনা ?

সুরমা নির্ভয়ে বললেন, স্তব-স্তুতিতে দেবীও খুশি। আপনাকে কি যেন ছাই মাথামুণ্ডু একখানা চিঠিও লিখেছিলুম।

শুনলে ত মণিমোহন ? শুনলে বড়বউ ?

তপেনবাবু ওধার থেকে বললেন, আমরাও শুনেছি।

আসরে একটা হাসির রোল পড়ে গেল। ওদিক থেকে ছেলেমেয়েরা উচ্চকিত হয়ে তাকালো। অনিলা উঠে এসে বললে, কি মা, হাসচো কেন অত ?

সুরমা বললেন, যা পোড়ারমুখী এখান থেকে। আমাদের এখন হিসেব নিকেশ হচ্ছে।

অনিলা হাসিমুখে চলে গেল।

মণিমোহন বললেন, আমাদের সেকালের 'ডনজুয়ানকে' মনে পড়ে, রায়সাহেব?

পড়ে, আমাদের রোহিণীকান্ত।

আচ্ছা বেশ, মনে পড়ে বনশ্রীকে?

রায়সাহেব বললেন, পড়ে বৈ কি, এই প্রস্‌পেক্টেইত আমাদের দলের সঙ্গে বনশ্রী এসেছিল। প্রতিমার মতন রূপ! মনে পড়ে, সুরমা?

সুরমা বললেন, খুব। রূপ দেখলে চোখ ঠিক্‌রে যেতো। তাকে দেখে আপনার কবিতা লেখার বাতিক হয়েছিল। তাও ভুলিনি।

শোভনা চোখ পাকিয়ে বললেন, তুমিও কম নও।

রায়সাহেব জোরে জোরে গড়গড়া টানতে লাগলেন।

সেই বনশ্রী আর রোহিণীকান্ত!—মণিমোহন আরম্ভ করলেন:

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা বলছি। বাঙ্গলা দেশের এক নামজাদা জমিদার বংশে ভাঙন ধরেছিল। বনশ্রী ছিল ছোট তরফের বাড়ীর বড় মেয়ে। আমরা যখন বনশ্রীকে দেখেছি তখন সে বাইশ তেইশ বছরের মেয়ে। কিন্তু তার

আগে তার জীবনে অদ্ভুত ঘটনা ঘটে।, তার বয়স যখন সাত, সেই সময়ে জমিদারী কাছারির মধ্যে এক দারোগা খুন হয়! সেই মামলার প্রধান আসামী হোলো বনশ্রীর বাবা শৈলেন্দ্র-নারায়ণ। তিনি ভাদ্রের দুর্যোগে আর বন্যায় পালাচ্ছিলেন স্ত্রী, ছেলে মেয়ে, বুড়ো মা আর মামাকে নিয়ে। ঝড়ে তাঁদের নৌকা ডুবি হোলো পদ্মার গর্ভে। বাঁচলো না কেউ, কিন্তু কোন্ এক জেলের ইলিশ ধরার জালে উঠলো পাতালকন্যা বনশ্রী। জেলে তাকে ঘরে এনে মানুষ করতে লাগলো। পুলিশের খাতায় আনুপূর্বিক কাহিনী লেখা হোলো। বালিকার সেই রূপরাশি আশপাশের সমস্ত গ্রামে বিস্ময় ছড়াতে লাগলো। বনশ্রী পদ্মার খাড়িতে দিনরাত সাঁতার দিয়ে বেড়ায় আর ভাটিয়ালি দেহতত্ত্বের গান শোনায় সবাইকে। কিন্তু বেশি দিন নয়, এগারো বছর বয়সে জেলের এক আত্মীয় নৌকোয় চড়িয়ে বনশ্রীকে সদর মহকুমায় আনে, মোটা টাকায় বিক্রি করে। বনশ্রী কলকাতায় আসে। বুঝে দেখো কারা তাকে আনে। তারপর যেমন করেই হোক সেই পল্লীর কাছাকাছি বনশ্রী এক গির্জায় পালিয়ে গিয়ে পুরোহিতের কাছে কান্নাকাটি করে। পুরোহিত খুবই দয়ালু, তিনি পুলিশে খবর দিলেন না বটে তবে সাদরে বনশ্রীকে খৃষ্টান করে নিলেন। বনশ্রী কনভেণ্টে থেকে পড়াশুনো করতে লাগলো। তোমরা শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে, মাত্র ন'বছরের চেষ্টায় সে

বি এ পাশ করে। কল্‌কাতায় তখন গ্রাজুয়েট মেয়ের সংখ্যা দুচারজনের বেশি নয়। রূপে আর লাবণ্যে, গুণ আর বিদ্যার চাকচিক্যে তখনকার কলকাতার বাঙ্গালী সমাজে বনশ্রীই ছিল আলোচনার বিষয়বস্তু।

পাশ করার পরে বাপের বাড়ীর গ্রামে ফিরে গিয়ে সে পৈতৃক সম্পত্তির ওপর দাবি জানায়। মামলায় সরকার তার পক্ষ নেন; বিবাদীরা আপত্তি জানিয়ে বলে, ছোট তরফের মালিক খুনের আসামী, পালাতে গিয়ে নৌকাডুবিতে সবংশে তলিয়ে যায়, বনশ্রী তাদের কেউ নয়। তা ছাড়া এ মেয়ে বিধর্মী। সম্পত্তি দাবি করে কোন্‌ অধিকারে? ফলে পুরোহিত, জেলে, জেলের আত্মীয়, কলিকাতার এক পতিতালয়, কনভেণ্টের কর্তৃপক্ষ—সমস্ত কিছুই মামলায় জড়িয়ে পড়ে। বনশ্রী মামলায় জয়লাভ করে। অর্থাৎ সে হঠাৎ একদিন লাখ দেড়েক টাকার মালিক হোলো। প্রমাণিত হয়ে গেল, স্বেচ্ছায় খ্রীষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করেনি, সে হিন্দু।

এমন দিনে শ্রীমান রোহিণীকান্ত আবির্ভূত হলেন।

তারপর?—শোভনা প্রশ্ন করলেন।

দেড় লাখ টাকা যে মেয়ের দাম, সে শ্যাওড়া গাছের পেত্নী হলেও ক্ষতি নেই। সুতরাং বুঝতেই পারেন সুন্দরী বনশ্রীর বাজার দর। কাব্যে যাকে বলা হয়, মধুলোভী মক্ষিকার দল—তারা এসে হানা দিল। বলা বাহুল্য সে জুয়ায় জিতলে

ডনজুয়ান রোহিণীকান্ত। ভয় নেই, এ গল্পে আপনাদের মতন পুরিটানরাও এতটুকু দুর্নীতি খুঁজে পাবেন না। রোহিণীকান্ত অবশ্য টাকার লোভে আসেনি, যদিও সে দরিদ্র—কিন্তু আশ্চর্য, কিছুকাল পরে রোহিণীর চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটলো। সে পারলো না বনশ্রীকে মুগ্ধ করতে, পারলো না ভালোবাসতে। একদিন সে মুক্তি চাইলো।

মানে ?—সুরমা প্রশ্ন করলেন।

মানে, ঈশ্বর জানেন। অথচ তোমরা দেখেছিলে রোহিণীকান্ত আর বনশ্রীকে একত্র। একজনকে বাদ দিয়ে আর এক জনকে ভাবা যেতো না। রোহিণী ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু বনশ্রী রাজি হয়নি।

মণিমোহন থামলেন, তারপর পুনরায় বললেন, এর পরে যা বলবো সেটা চিকিৎসাশাস্ত্রের এক সমস্যা!

রায়সাহেব প্রশ্ন করলেন, অর্থাৎ ?

শোভনা দেবী প্রশ্ন করলেন, রোহিণী অসচ্চরিত্র বলেই কি বনশ্রী রাজি হয়নি বিয়ে করতে?

সুরমা বললেন, এক সঙ্গে রইলো অথচ বিয়ে হোলো না? ছেলে আর মেয়ে দুজনেই ভালো নয়।

মণিমোহন একবার উপর দিকে তাকালেন। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে প্রসপেক্টের ছায়াপথে। অরণ্যপক্ষীরা গাছে গাছে কলকাকলী সুরু করেছে। আকাশ সোনার রৌদ্রে আর নীল

বন্যায় উদ্বেলিত। লঘু মেঘ উড়ে চলেছে। সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তিনি বললেন, চরিত্রের দিক থেকে রোহিণীর অবশ্য বিশেষ দুর্নাম ছিল, বনশ্রী সম্পূর্ণ ই সে সংবাদ রাখতো। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই, বনশ্রী সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেনি। বাঙ্গলার বহু রাজপরিবার থেকে বহু সৎপাত্র তার জন্য সাধনা করেছে, কিন্তু বনশ্রীর মন টলেনি। তারপর একদিন হঠাৎ একটা কথা জানা গেল।

রায়সাহেব বললেন, কি রকম ?

পুলিশ রোহিণীকে গ্রেপ্তার করেছে, রোহিণী রেল লাইনের ওপর শুয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল।

কেন ?

বলেছি ত আগে, বনশ্রী হোলো চিকিৎসাশাস্ত্রের একটা সমস্যা। যে মেয়ের অত বিদ্যা, অত রূপ, অমন আশ্চর্য স্বাস্থ্য, সেই মেয়ের কথায় যেন একটা অসাড়তা। বনশ্রী ছিল ফেমিনিষ্ট। মেয়েদের জন্যে ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করা, নার্সিং শেখানো, ব্যায়াম চর্চা, সামাজিক আন্দোলন করা, বিবাহ বিচ্ছেদ,—ইত্যাদি ব্যাপারে সে উৎসাহী। তার ধারণা, পুরুষরা চিরকাল ধরে মেয়েদের ওপর অত্যাচার করে চলেছে। এর একমাত্র প্রতিকার, মেয়েরা আর্থিক ব্যবস্থায় নিজেদের পায়ে দাঁড়াবে, পুরুষকে আশ্রয় দেবে না এবং সন্তান ধারণও করবে না। এই কাজে রোহিণীকে সে ব্যবহার করতো।

কিন্তু সকল কাজের ফাঁকে ফাঁকেই রোহিণী লক্ষ্য করতো, বনশ্রীর হৃদয়ে কোনো সাড়া জাগানো যায় না; সেন্টিমেণ্ট বলে কোনো পদার্থ তার মধ্যে নেই। দুজনে একত্র চলেছে দেশদেশান্তর, একত্র থেকেছে মাসের পর মাস—কিন্তু বনশ্রীর স্বভাবের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছিল যেন কেমন কঠোর নির্দয়তা, সেটা তার বৈরাগ্য থেকে প্রকাশ পেতো। বাইরে অতি সুন্দর,—বনশ্রী আর রোহিণী সর্বত্র বেড়িয়ে বেড়ায়। তরুণ মন, তরুণ শরীর,—দুজনের অপরূপ সাজসজ্জা। এমনও জানা যায় বনশ্রী সাজিয়ে দিয়েছে রোহিণীকে রাজকুমারের বেশে। মেয়েটা ফুল ভালোবাসতো, সংস্কৃত কাব্য ছিল তার অতি প্রিয়, রোহিণীর গান শুনতে শুনতে পুরীর সমুদ্রতীরে সে ঘুমিয়ে পড়তো, শুক্লপক্ষের দিকে রোহিণীর সঙ্গে গঙ্গায় নৌকো চড়া ছিল তার একটা মস্ত আনন্দ—কিন্তু সবই মিথ্যে, সেই রোহিণী একদিন আত্মহত্যা করতে উদ্যত হোলো।

কেন হবে না, বলুন?—মণিমোহন বলতে লাগলেন, সে যন্ত্রণা অমানুষিক। রোহিণীর মতন ছেলে,—যে ছেলে শাস্ত্র-সমাজ-নীতি সংস্কার কিছুই মানে না, স্ত্রীলোককে জয় করে চলাই যার যৌবনকালের একমাত্র কাজ, সে বাধা পায় পদে পদে, তার অনুনয় বিনয়-কান্না-প্রার্থনা সমস্তই ব্যর্থ হয়। দিনের পর দিন বরফের স্তূপে মাথা ঠোকে। দুরন্ত আগ্রহে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ক্ষত বিক্ষত হয়ে আবার ফিরে আসে।

অথচ এই বনশ্রী—মণিমোহন বলতে লাগলেন, অদৃষ্টের মতন রোহিণীর সঙ্গে সঙ্গে থাকতো। একটি ঘণ্টা, একটি বেলা রোহিণীর পক্ষে চোখের আড়ালে থাকা সম্ভব ছিল না। ছায়া যেমন থাকে কায়ার সঙ্গে। সমস্ত কাজ, সমস্ত বিষয়, সমস্ত সামাজিক জীবন থেকে রোহিণীকে ছিনিয়ে নিয়ে,—বাঘিনী যেমন তার শিকারকে সামনে রেখে বিশ্রাম করে,—তেমনি ক'রে রোহিণীকে সে রাখতো চোখে চোখে। পালাবার পথ নেই, এড়াবার সুযোগ নেই, প্রতিবাদ করবার সাধ্য নেই, ত্যাগ ক'রে যাবার উপায় নেই,—রোহিণীর সেই মন্ত্রণা, সেই বিভীষিকা অবর্ণনীয়। জেলের কয়েদী যেমন আলোবায়ুহীন নির্জন কক্ষে হাত পা বাঁধা অবস্থায় থাকতে বাধ্য হয়,—সেই-ভাবে রোহিণী অবরুদ্ধ যাতনায় দিন কাটাতে লাগলো। সেই দৃশ্যে কী আনন্দ বনশ্রীর!

দীর্ঘ ছ বছর,—হ্যাঁ, দীর্ঘ ছ বছর এই যন্ত্রণা সহ্য করার পর রোহিণীকান্ত আর পারলো না, হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হোলো।

কোথায়?—সুরমা প্রশ্ন করলেন।

ইউরোপে তখন যুদ্ধ চলেছে। বনশ্রী খবর নিতে গিয়ে জানলো, বাঙ্গালী পল্টনের সঙ্গে রোহিণী পালিয়েছে মেসো-পটেমিয়ায়। একেবারে সে নিরুদ্দেশ।

বনশ্রী খুঁজতে বেরোয়নি?

না। অনেক দিন পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে সে একটা কুকুর পুষেছিল। তার নাম দিল রোহিণী!

সকলে নির্বাক স্তব্ধ হয়ে রইলো। মণিমোহন বললেন, তারপর দশ বছর কেটে গেল! বনশ্রী তার দূর সম্পর্কের ভগ্নীর এক মেয়েকে এনে ইতিমধ্যে মানুষ ক'রে বিয়ে দিয়ে ছিল। মেয়েটির নাম মৃণাল। মৃণালকে স্বামীর কাছ থেকে বনশ্রী সরিয়ে রেখেছিল। সে আর এক বীভৎস কাহিনী। একথা আপনারা ভুলে যাবেন না বনশ্রী ছিল ফেমিনিস্ট। পুরুষ পাছে অত্যাচার করে এজন্য মৃণালকে সংসার করতে দেওয়া কিছুতেই চলে না,—কেউ সন্তানের জননী হয়েছে শুনলে বনশ্রীর মাথায় আগুন জ্ব'লে উঠতো। যে কোনো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্যে বনশ্রী বহু টাকা খরচ করতে পারতো। একদিকে ছেলেদের অবিবাহিত রাখা আর একদিকে মেয়েদের কুমারী ক'রে রাখা তার আপ্রাণ চেষ্টা ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, এই ছিল তার বিলাস। একদল ছেলেকে আর একদল মেয়ের কাছাকাছি রেখে মাঝখানে সে থাকতো দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের মতন। উভয় পক্ষ দগ্ধ হচ্ছে দেখলে সে উগ্র আনন্দে অধীর হোতো।

তারপর? মৃণালের কী হোলো?

ঠিক জানিনে। তবে শুনেছি, কয়েক বছর পরে মেয়েটির শরীরে রক্তাল্পতা ঘটে, তারপর দুরারোগ্য রোগে

সে মারা যায়। ছেলেটি যায় নোংরা জীবনের মধ্যে তলিয়ে!

ওদিকে রান্নার আয়োজন প্রস্তুত। রান্নার বিষয় নির্দেশ ক'রে দেবার জন্য তপেনবাবু হাঁক দিলেন, ওহে ব্যাচিলর, বনভোজন কেবল গল্পে নয়, ভোজনেও বটে। হাওয়া এখানকার ভালো নয়, এরই মধ্যে ক্ষিধে পেয়ে গেল।

এই যে, উঠি।—ব'লে মণিমোহন উঠে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, রামখেলাওন্, এদের সবাইকে ডিম সেদ্ধ, টোস্ট আর চা দিয়ে যা।

শোভনা উৎসুক হ'য়ে বললেন, কই মণিবাবু, সবনাশী কবে মারা গেছে, বললেন না ত?

মুখ ফিরিয়ে মণিমোহন বললেন, মারা যায় নি ত? ওঃ, তার মৃত্যুর এখনো অনেক দেরি। শরীর তার খুব শক্ত আছে। বাঁধন ভালো কিনা।

কোথায় থাকে এখন?

মণিমোহন থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, ছত্রিশ সালে আমি ছোটনাগপুরে গিছলুম বিশেষ কাজে কয়েকদিনের জন্যে। সরকারী তদন্তে আমাকে যেতে হয়েছিল রাঁচীর পাগলা গারদের মেয়ে বিভাগে। আমি চিনতে পারিনি আগে, কিন্তু পাগলিনী বনশ্রী আমাকে চিনতে পেরেছিল। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, কিন্তু সেই অটুট স্বাস্থ্য। গায়ের রং জ্ব'লে গেছে।

বীভৎস, আলুথালু, বনমানুষীর মতন ভয়ঙ্কর। শুনলুম, একটি পাঁচ বছরের ছেলে, আর একটি তিন বছরের মেয়েকে সে খুন করে এসেছে ওখানে আসবার আগে। আমাকে দেখে বনশ্রী তার মাংসল, বীভৎস মুখে একটুখানি হাসলো। হেসে জিজ্ঞেস করলো, ফিরে এসেছে সে?—কিন্তু উত্তর শোনার দরকার তার ছিল না, রোহিণীর একটা প্রিয় গান গুন গুন ক'রে গেয়ে সে চ'লে গেল। হ্যাঁ, বাঁচবে সে অনেকদিন। অনেক টাকার মালিক কিনা, তাই খুব যত্নে আছে।

মণিমোহন চ'লে গেলেন রান্নার তদ্বিরে। সুরমা এবং শোভনা স্তব্ধ হয়ে রইলেন। ললিতবাবু দ্রুত গড়গড়ার পাইপ টানতে লাগলেন।

* *

*

দূরের ইতিহাস থেকে যেন বিষণ্ণ বাতাস আসছিল করুণ নিশ্বাসের মতো।

সেদিন যারা এসেছিল এই প্রস্‌পেক্টে, অনেকেই সুখী হ'তে পারেনি।—সুরমা ধীরে ধীরে বলতে সুরু করলেন, সব মনে নেই, অনেককালের কথা হোলো। আচ্ছা চন্দ্রবাবুকে আপনার মনে পড়ে, রায়সাহেব?

নলটা মুখ থেকে সরিয়ে ললিতবাবু বললেন, চন্দর ভট্‌চায? হ্যাঁ, চিনতুম বৈ কি। দুর্গাপুরের-রাজবাড়ীতে বিয়ে করেছিল।

হ্যাঁ, তারই কথা বলছি।

ললিতবাবু বললেন, ভারি হৃদয়বান ছেলে ছিল, কিন্তু ভয়ানক একগুঁয়ে। বাঘ শিকারে বেরিয়েছিল আসামের দিকে, মাঝপথে দুর্গাপুরের পাইকরা ওকে ধ'রে নিয়ে যায়, জোর ক'রে বিয়ে দেয় রাজবাড়ীর এক কানা মেয়ের সঙ্গে। চন্দরের বাপের অবস্থা খুব ভালো ছিল।

সুরমা বললেন, কেউ বলে জোর ক'রে, আবার কেউ বলে, চন্দরের সঙ্গে ভাব হয়েছিল বাসন্তীর। ওরা দুজনে ঘোড়ায় চ'ড়ে পালাতে গিয়ে এক জঙ্গলে ধরা পড়ে।

বলো কি? মিডিভাল্ নাইট্? হ্যাঁ, বেশ মনে পড়ে, চন্দরের চেহারাটাও তেজীয়ান পুরুষের, কেমন যেন একটা সিভল্রির ছোঁয়াচও ছিল। তারপর?

সুরমা বলতে লাগলেন, রাজবাড়ীর গারদখানায় চন্দ্রবাবুকে আট্‌কে রাখে,—সেকালে জমীদারদের ঘরে যেসব অত্যাচার করা হোতো, সেসব খবর বাইরে আসতে পারতো না,—চন্দ্রবাবুর ওপরেও সেই সব অত্যাচার করতে লাগলো। ওদিকে তাঁকে খুঁজে আনার জন্য কল্‌কাতার পুলিশ তন্ন তন্ন করতে লাগলো। এদিকে গারদের প্রহরীকে প্রতিদিন গভীর রাতে একখানা গিনি উপহার দিয়ে বাসন্তী দেখা করতো চন্দ্রবাবুর সঙ্গে।

অ্যাঁ?—ললিতবাবু বললেন, এ যেন একেবারে মোগ্‌লাই যুগের নাটক!

সুরমা হেসে উঠে বললেন, একদিন ওরা দুজনে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছিল সেই গারদখানার মধ্যে।

শোভনা স্নেহের সুরে বললেন, আহা, ছেলেমানুষ ত?

সুরমা বললেন, তারপর, যেমন ক'রেই হোক, দুজনের বিয়ে হয়। ওরা কল্‌কাতায় আসে। চন্দ্রের বাবা আগুন হয়ে উঠলেন। ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করলেন। স্ত্রীকে নিয়ে ছেলে বেরিয়ে পড়লো রাস্তায় নিঃসম্বল হয়ে।

ললিতবাবু বললেন, একেবারে নাটকীয় উপন্যাস। তারপর?

তারপর আর বিশেষ খবর পাওয়া যেতো না। কিন্তু বড়লোকের ছেলে-মেয়ে, তারা কখনো রোদেও পোড়েনি, বৃষ্টিতেও ভেজেনি। সংসার বড় নিদয়, ওরা যুদ্ধে হেরে যেতে লাগলো।--সুরমা বলতে লাগলেন, কিন্তু বিপদের কথা এই, দুবছরের মধ্যেই তাদের প্রণয়ের স্বপ্ন চূরমার হয়ে গেল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কুৎসিত ঝগড়া আর অতি নোংরা গালিগালাজ চলে,—এতটুকু বনিবনা নেই। অভাবের আগুনে পু'ড়ে ছাই হয়ে গেল স্বামী-স্ত্রীর গভীর সম্পর্ক।

শোভনা বললেন, সে কি?

কি জানি, হয়ত সচ্ছল সংসার হ'লে তারা সুখী হ'তে

পারতো, হয়ত অভাবের মধ্যে ভালোবাসা শুকিয়ে ম'রে যায় —ঠিক কিছু বলতে পারিনে। এমনি ক'রে ওদের দীর্ঘ দশ বছর কাটলো। এর মধ্যে আবার ঈশ্বরের অভিসম্পাৎ। এক একটি ক'রে তিনটি বিকলাঙ্গ সন্তান ভূমিষ্ঠ হোলো, তার মধ্যে একটির মৃগীরোগ। এর ফলে উপবাসী স্বামী-স্ত্রীর জীবনযাত্রা হোলো আরো ইতর, আরো ভীষণ। অবশেষে একদিন স্বামীকে লুকিয়ে বাসন্তী রাত্রিবেলা বেরিয়ে পড়লো পথে। বাসন্তী আর কোনদিন ফেরেনি। ওদিকে একটি শিশু মারা গেল, বাকি দুটি বিকলাঙ্গ সন্তানকে নিয়ে চন্দ্রবাবু বেরিয়ে পড়লেন। আজকাল তিনি আমাদের ওখানকার এক কাঠগোলার কেরাণী। ভয়ানক নেশাখোর।

নিঃশ্বাস ফেলে ললিতবাবু বললেন, আর রাজকুমারী শ্রীমতী বাসন্তী ?

তার কথা আর না শোনাই ভালো। বয়স হ'লেও চেহারাটা তখনো নষ্ট হয়নি, সুতরাং অভাব কিছু তার রইলো না।

সুরমা আর শোভনা পরস্পরের দিকে চেয়ে ইঙ্গিতে কি যেন কথা কইলেন। ললিতবাবু বললেন, হ্যাঁ, তা বটে। বুঝলুম।—এই ব'লে গড়গড়ার নলটা মুখে তুলে আবার তিনি তামাক টানতে লাগলেন।

সমস্ত দিনটা এমনি পুরনো ইতিহাস মন্থন ক'রেই

কাটলো। পড়ন্ত রোদের সঙ্গে সঙ্গে শীতের হাওয়া হাত-পা কাঁপিয়ে নেমে এলো। আসর গুটিয়ে তখন ফিরে যাবার পালা!

কালের বিবর্তন, মানুষের ভাগ্য বিপর্যয়, সুখ-দুঃখ আর নৈরাশ্য-আনন্দের আলো ছায়া—কিন্তু প্রস্‌পেক্টের কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। দূরে চাইল্, ওদিকে তারাদেবী, নীচে কার্ট রোড, এধারে ছোট শিমলা, ওধারে মাসোব্রা,—মাঝখানে প্রস্‌পেক্ট তার অরণ্যে, তার ঝরাপাতায়, তার বন্য-গন্ধে, তার নির্জনতায় সেকাল থেকে একাল অবধি অসীম বৈরাগ্য নিয়ে অটল স্তব্ধ। জরা তার নেই কিন্তু মহাস্থবির! যুগযুগান্তর ধ'রে কত লোক আসে তার প্রসারিত পদমূলে, কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ প্রস্‌পেক্ট অন্তর্লীন জপের মন্ত্র নিয়ে চোখ বুজে ব'সে থাকে।

যাবার সময় তপেনবাবু এবং তাঁর বন্ধুরই কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল। ললিতবাবু, সুরমা, শোভনা, মণিমোহন—তাঁরা নিঃশ্বাস ফেলে চললেন নিঃশব্দে। আজ এখান থেকে তাঁদের শেষ বিদায়। দুএকদিনের মধ্যেই তাঁরা দেশে ফিরবেন। সাংসারিক বিষয়ের সহস্র কোলাহলের মধ্যে আজকের স্মৃতি ডুবে যাবে—এ তাঁরা জানেন। এটা কেবল মোহ, পারি-পার্শ্বিকের প্রভাবে সাময়িক স্মৃতিসঞ্চার—আর কিছু নয়।

চাকরেরা আগেই চ'লে গেছে জিনিসপত্র লটবহর নিয়ে।

আগে আগে চলেছেন সবান্ধব তপেনবাবু, তাঁদের পিছনে মণি-মোহন, সুরমা, শোভনা আর রায়সাহেব, তারপরে রতীন আর অনিলা। সকলের পিছনে কেশব আর সুনীলা।

সুনীলা মৃদু মধুর আবিষ্টকণ্ঠে বললে, আবার হয়ত কতদিন পরে আসবো এখানে, কোন্ যুগে তার ঠিক নেই।

কেশব গলা খাটো করে করুণ স্বরে বললে, হয়ত নাও আসতে পারি, সুনীলা।

না এলেও আজকের দিনটা মনে থাকবে গভীর হয়ে।

মনে থাকার মতো সৌভাগ্য আমার নয়, যদি থাকে ধন্য হবো। এখানে এসে হয়ত কিছু পেলুম, হয়ত পেলুম না। কিন্তু এই স্মৃতিটুকু চিরদিন ধ'রে—

সুনীলা হেসে উঠলো। বললে, আর যদি এমন হয় কিছু পেয়েও হারালো?

এর পরে দুটি তরুণ-তরুণীর যা আলাপ, তার বিষয়বস্তুটি আবহমানকালের; ভঙ্গী নতুন, বস্তু অতি পুরাতন। কিন্তু সুনীলার অসতর্ক হাসির ঝলকে সুরমা আর ললিতবাবুরা চলতে চলতে চকিতভাবে একবার পিছন দিকে তাকালেন। একটি মুহূর্ত মাত্র, পরক্ষণেই উচ্চ হাসির রোলে মণিমোহনের সঙ্গে সুরমা ও রায়সাহেব সারা পথ মুখর ক'রে তুললেন। সেই কৌতুক-পরিহাস বৃদ্ধরাই করতে জানে তাদের অতীত যৌবনকে, সকল কালের সকল তরুণ তরুণীকে।

মূলমন্ত্র

তুচ্ছকে তুচ্ছ ব'লে জানবার সীমাহীন স্পর্ধা এই বিজ্ঞানের যুগে নেই। শরতের সোনার রৌদ্রে আকাশকে দেখা যায় নীল, কিন্তু হয়ত সেটা আকাশও নয়, তার রং নীলও নয়। যা দৃশ্যমান তার সমস্তটাই যে দেখতে পাই, জোর ক'রে একথা বলা চলেনা।

এই ভূমিকাটুকু না করলেই হয়ত শোভন হোতো। কিন্তু মানুষের চোখের মধ্যেও যে কুয়াশা আছে, একথা অনেকেই অস্বীকার করবেন না। সেই দৃষ্টি-কুয়াশার চলতি নাম অনেকেই বলে রোমান্স,—পৃথিবীর সভ্যতার আজ যত বড় অপমৃত্যুই ঘটুক না কেন,—এই দৃষ্টি-কুয়াশা আবহমান কাল ধ'রেই অসাধ্য সাধন ক'রে চলেছে। অর্থাৎ মিথ্যাকে সে মনোহর ক'রে তোলে, নারীর মাংসপিণ্ডের ওপর কাব্যের ব্যঞ্জনা ছড়ায়, এবং তার চেয়েও বিচিত্র,—লাল রংকে বলে রক্তিম।

এই মনোহর মিথ্যা আছে ব'লেই পাশের বাড়ীর সীতাকে চিনতে পারা কঠিন হয়েছিল। ওরা নতুন ভাড়াটে, কিন্তু নতুন ভাড়াটের সংসারে অভিনবত্ব কিছু আছে, একথা ভেবে দেখার

মতো সময় আর যেখানেই থাক, এ পাড়ার কারো নেই। কলিকাতার একান্তে পুরাতন ঘিঞ্জি পল্লী,—ধূলোয়, ধোঁয়ায়, যক্ষ্মায়, টাইফয়েডে, নোংরায়, নর্দমায়—সে পল্লী অপরূপ; সেখানে শুধু জৈব-জীবনকে কায়-ক্লেশে বাঁচিয়ে রাখার অসাধারণ অধ্যবসায় চোখে পড়ে, এই অকালমৃত্যুর দেশে রুগ্নের আর বিকৃতের বিস্ময়কর ভাবে বেঁচে থাকার ক্ষমতা সেখানে দেখলে স্তব্ধ হ'তে হয়।

আত্মপরতা আর চিত্তদারিদ্র্যে জর্জর এই জনতার ঠিক মাঝখানে এসে তপন একটি ঘরভাড়া নিয়ে সেদিন সীতাকে আনলো, সেদিন আশেপাশে কেউ ভ্রূক্ষেপ করেনি। কত আসে, কত চ'লে যায়। কেউ ভাড়া দিতে না পেরে তাড়া খায়, কারো শিশু তড়কায় ভুগে মরলে নিজে থেকেই চলে যায়, কেউ রোগের দায়ে ঘর ছাড়ে,—আবার কারো বেকার জীবনে একটা ছোটখাটো চাকরি জোটে, মুদির দেনা শোধ করে, স্ত্রীর মুখে হাসি ফোটে, হয়ত বা মায়ের যত্ন একটু বেড়েই যায়। কিন্তু সৌভাগ্যে, বিপদে, আনন্দে, অশ্রুতে—একজন আর এক জনের প্রতি নির্বিকার। এই পল্লীর প্রকাণ্ড জনতার মধ্যে সকলেই একা, প্রত্যেকেই নির্লিপ্ত। এখানে কোনো বৈচিত্র্য নেই, আশা নেই, দুঃসাহস নেই, দিবাস্বপ্ন নেই।

নিচের তলায় একটিমাত্র ঘর, ঘরটি ছাড়া পুরনো বাড়ীর এই নিচের তলার অন্ধকারে আর কোথাও কোনো অবকাশ

নেই। রান্নার একটুখানি জায়গা আছে বটে, কিন্তু সেখানে নিয়মিত রান্নার কোনো আয়োজন দেখা যায় না; আহারাদির ব্যাপারটা কোথায় হয়, একেবারেই হয় কিনা, তাও বলা কঠিন। সুতরাং সে-জায়গাটুকু প্রায় খালিই প'ড়ে থাকে, কেবল সন্ধ্যারাত্রের পর মাঝে মাঝে একটা বড় রাস্তার কুকুর সেখানে এসে রাত্রির আশ্রয় ঠিক ক'রে নেয়। সীতা দু' একবার তাকে তাড়না ক'রে গিয়েছিল, কিন্তু কুকুরটা নিশ্চিন্তে মাথা তুলে এমন নিরাসক্ত স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়, যেন মনে হয় মানুষের মতো তার দুই চোখে নিগূঢ় অর্থ,—সে-চোখ দেখলে ভয় করেনা, বরং লজ্জা হয়। সীতা চ'লে যাবার পর কুকুরটা আবার মাথা নিচু ক'রে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোতে থাকে।

কিন্তু বাড়ীর যিনি মালিক, কুকুরকে নিয়ে কবিত্ব করলে তাঁর চলে না। ঘরটির জন্য মাসে মাসে এগারো টাকা তাঁকে আদায় করতেই হয়। রান্না হয় কিনা, কুকুরটার অন্য আশ্রয় আছে কিনা—এ তাঁর জানার দরকার নেই। তপনও কিছু জানাতে চায় না। তাছাড়া কলিকাতার যেখানেই যাও, এর কম ভাড়ায় ঘর পাওয়াই কঠিন। এ-পাড়ার বাড়ীগুলোর মধ্যে তার এই ঘরটাই যা একটু ভালো,—উই-পোকা আর আরসোলার উৎপাত কিছু আছে, কিন্তু সে কোন্ বাড়ীতে নেই?

ঘরের আসবাব পত্রের আলোচনা না তোলাই ভালো। বাড়ীওয়ালার দরুণ কাঠের একখানা চৌকি এই সেদিনও তপনের ঘরে ছিল, কিন্তু ঘুনধরা চৌকি মানুষের ভার বহন করতে না পেরে হঠাৎ মাঝরাত্রে একদিন মড়মড় ক'রে ভেঙে পড়ে। সে-রাত্রে আর কিছু নয়, পাড়া সচকিত ক'রে সীতা আর তপনের উচ্চ উল্লোলিত হাসি দশ মিনিট ধ'রে আর যেন থামতেই চায় না। সেই কলকণ্ঠের দায়িত্বজ্ঞানহীন হাসি আর যেখানেই হোক, গৃহস্থঘরের পক্ষে বেমানান। কিন্তু ঘুমের ঘোরে তক্তা ভেঙে পড়ার সেই হাসি-পরিহাস দু'জনের মধ্যে সমস্ত রাত ধ'রে অব্যাহত চলতে লাগলো। তক্তা ছাড়া আর কোনো গৃহসজ্জার আলাপ করাও একটু কষ্টকর। ময়লা একটা মশারি তাদের সঙ্গে ছিল কিন্তু সেটা এতই ছিন্নভিন্ন যে, ওটাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে শাড়ির ফালি দিয়ে বেঁধে বালিশ ক'রে মাথায় দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সতরঞ্চি একখানা ছিল বটে, তবে তার ওপর ভদ্রগোছের একখানা কাঁথা পাতা হোতো,—সেখানা সীতার ছোটপিসির দেওয়া। গৃহসজ্জার মধ্যে আর দুটি লক্ষ্য করবার বস্তু ছিল। তার মধ্যে একটি পুরনো সুটকেস,—সেটার কলকব্জা নষ্ট হওয়ার জন্য চাবি-পত্রের বালাই ছিল না ; চামড়ার বদলে একগাছা শোনদড়ি দিয়ে সেটাকে বাঁধতে হোতো। দ্বিতীয়টি একটি চটের থলে, তার মধ্যে থাকতো যা কিছু অস্থাবর সম্পত্তি। ওদের ঘরে

ঢুকলে প্রথমেই মনে হতে পারে, আর যাই হোক, গৃহস্থালী এদের স্থায়ী নয়, ওরা যেন কোনো তীর্থযাত্রী,—ধর্মশালায় ঢুকে আশ্রয় নিয়েছে মাত্র।

মেয়েটির বর্ণনা করতে গেলে সঙ্কুচিত হতে হয়। অভাবের সংসারে অনেক মেয়েরই চুলের রাশিতে তেল পড়েনা জানি, কিন্তু চুলের যত্নের অভাবে মাথায় জট পড়ে ক'জনের? দেহে কোথাও আভরণ নেই, হাতে কেবল দু'গাছি ফ্যান্সি কাঁচের বালা; কিন্তু সীতার দীপ্তশ্রী সেই দুগাছি সুন্দর বালার সমন্বয়ে সমস্ত চেহারাটায় ছন্দের ব্যঞ্জনা এনে দিয়েছে। মনে হয় ওদের অর্থ নেই বটে কিন্তু রুচি আছে। সোনার অলঙ্কার হয়ত ওই দেহের ঐশ্বর্য-প্রাচুর্যের নিচে চাপা প'ড়ে ম্লান হয়ে যেতো।

ওদের গৃহস্থালীর দিকে কারো লক্ষ্য করবার অবসর ছিলনা; অত্যন্ত শান্ত, নিঃশব্দ তাদের জীবনযাত্রা। সেই বিশেষ রাত্রির হাসির শব্দটুকু ছাড়া ওদের অস্তিত্বের পরিচয় আর কিছু পাওয়া যায়নি। মেয়েটির রূপের আকর্ষণ হয়ত কিছু ছিল, কিন্তু তার চলাফেরা আনাগোনা এতই গোপন যে, পাড়ায় কারো কোনো কৌতূহল ছিল না। যেন একটা দুর্ভেদ্য দুর্গের রহস্যময় সুড়ঙ্গে তারা দুজনে বিলীন হয়ে থাকতো।

কিন্তু রহস্য দিয়ে ঘিরে রাখলেও প্রত্যহের বাস্তব জীবন-যাত্রাকে এড়ানো চলেনা। এক আধদিন অবশ্যই মাটির

হাঁড়িতে ভাত ফুটতো, তরকারীর বদলে প্রায়ই দেখা যেতো, মাংসের হাড়ের টুকরো ওরা উঠোনে ফেলে দিয়ে গেছে। কিন্তু এসব ক্বচিৎ, বেশির ভাগ দিনই দেখা যায়, ময়রার দোকানে কেনা তরকারির দাগমাখা শালপাতাগুলি ওদের ঘরের সুমুখে ছড়ানো এবং সন্ধ্যার সেই কুকুরটি অন্ধকারে চোখ বুজে ব'সে সেগুলো চাটাচাটি করছে।

এই কুকুরটিকে নিয়েই আর একদিন রাত্রে একটি হাসির ঘটনা ঘটলো। কুকুরটি অকাতরে তখন নিদ্রিত। একখানা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে ঘরের মেঝেয় তপনের চোখে তখন সবেমাত্র তন্দ্রা নেমেছে। এমন সময় একখানা কেরোসিন তেলমাখা জ্বলন্ত শাড়ি সহসা এলোমেলো ভাবে নিদ্রিত কুকুরটার সর্বাঙ্গ আবৃত ক'রে ঝুপ ক'রে পড়লো। উদ্‌ভ্রান্ত কুকুর চকিতে পালাবার চেষ্টা করলো কিন্তু শাড়ির জটলায় তার পা আটকিয়ে দিশাহারা চীৎকারে সে ছুটোছুটি করতে লাগলো। রাতে সদর দরজা তখন বন্ধ। সেই বীভৎস দৃশ্য দেখে সীতা যখন লুটোপুটি খাচ্ছে, তপন ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। অগ্নি আভায় নিচের তলাটা তখন রাঙা।

আগুনের ফাঁদ অবশ্য অতিক্রম করতে কুকুরটার দেরি হোলোনা, কিন্তু তার উৎকণ্ঠ করুণ চীৎকারে বেশ শোনা গেল, অগ্নিশিখায় তার সর্বাঙ্গের লোম আর চামড়া অনেকটাই

পুড়ে গেছে। অত রাতে চারিদিক তখন নিদ্রায় নিশুতি।

সদর দরজা খুলে কুকুরটাকে বা'র ক'রে দিয়ে এসে তপন চাপা কঠিন কণ্ঠে বললে, কি করলে তুমি ?

কলকণ্ঠীর হাসির ফেনা তখনও অনর্গল মুখ দিয়ে ঝ'রে পড়ছে। সহসা হাসি থামিয়ে চোখ পাকিয়ে সীতা বললে, খুব করেছি। কী করবে তুমি ?

দাঁত দিয়ে সে অধর চাপলো। বিদ্যুতের ঝলক দেখা গেল তার কৃষ্ণতারকায়। দুরন্তপনায় আঁচলটা লুটিয়ে পড়েছে মেঝের উপর। তার সেই আলুথালু বিবশা চেহারার দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে তপন বললে, শাড়িখানি পোড়ালে, আর কাপড় কোথায় ?

এই ত'—ব'লে সীতা নিজের পরণের কাপড়খানাই দেখিয়ে দিল। এই একখানা শাড়িই তার ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে যথেষ্ট !

সে-রাত্রে দুজনের মধ্যে আর কোনো আলাপ হোলো না বটে কিন্তু বিপন্ন কুকুরটার দুরবস্থার কথা মনে ক'রে পাগলিনীর হাসি তপনের আলিঙ্গনের মধ্যে মাঝে মাঝে মাদকরসের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগলো। একখানা হাতে তপনের গলা জড়িয়ে পোড়ারমুখী মুখ গুঁজে পড়েছিল।

সেদিন দুপুরবেলায় উপরতলা থেকে একটি কুমারী মেয়ে নেমে ওদের দরজার কাছে দাঁড়ালো। তপন বেরিয়েছে,

তখনো ফেরেনি। গায়ে প'ড়ে মেয়েটি আলাপ ক'রে বললে, আজ তোমাদের রান্না হয়নি কেন, ভাই ?

সীতা সটান মিথ্যাভাষণ করলো। বললে, ওঁর আজ নেমন্তন্ন, আর আমার অল্প অল্প জ্বর, তাই রাঁধিনি।

কিন্তু কালকেও ত তোমাদের রাঁধতে দেখিনি ?

সীতা কাছে এসে বললে, 'কালকে ?—এই ব'লে অহেতুক সে হাসতে লাগলো। পুনরায় বললে, কালকের কথা কিছু মনেই নেই। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কাল আমার বড়দিদি একরাশ খাবার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

মেয়েটির কেমন যেন সন্দেহ হোলো। এদের ঘরের মধ্যে কেমন একটা অজ্ঞাত অশরীরি সংশয় যেন লুকিয়ে রয়েছে। ভিতরে ঢুকলো না, বাইরে দাঁড়িয়েই প্রশ্ন করলো, তোমার তপনবাবু চাকরি করেন না ?

সীতার মুখে গৌরবের একটি আভা ফুটে উঠলো। বললে, না, চাকরিকে উনি ঘেন্না করেন। উনি ছবি আঁকেন।

ছবি ? দেখাও না একটু, উনি কেমন আঁকেন ! ওমা, তক্তাখানা ভেঙে পড়েছে ত' ঘর থেকে বে'র ক'রে দাওনি কেন, ভাই ? কী অগোছালো তোমাদের ঘর।

কিন্তু কোনো কথাই সীতার কানে গেল না। সুটকেসের ডালা তুলে পুরু কাগজে তুলি দিয়ে রঙীন ক'রে আঁকা তপনের কয়েকটি ছবি সে বা'র ক'রে আনলো। নিরপেক্ষ বিচারকের

মতো এক একখানা ছবি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা ক'রে সহসা মেয়েটি বললে, ওমা, এখানা যে তোমার ছবি !

আমার ? কই দেখি ?—ব'লে সীতা সেখানা হাতে নিল।

ছবিখানায় তাকেই তপন এঁকেছে বটে। দাঁত দিয়ে অধর চাপা। বিদ্যুতের ঝলক দুই চোখের কৃষ্ণতারকায়। সুডোল নিটোল বক্ষের একাংশ নিরাবরণ ; স্তনমূলে যেন একটি রাঙা ভ্রমর আঁকা। আঁচল লোটানো নিচে ; আলুথালু চেহারা ; জটাজটিল কেশরাশি। সে একটু হেসে মুখ তুললো, তার মুখের বন্য দীপ্তি দেখে মেয়েটি বললে, সত্যি, খুব সুন্দোর তুমি।—আচ্ছা, তোমাকে এমনভাবে উনি রেখেছেন কেন, ভাই

রূপের সুখ্যাতির নেশায় সীতা মুগ্ধ হয়েছিল। সহসা ফস ক'রে বললে, সেই কথা বলে কে ! অত্যাচার অনেক সহ্য করি, ভাই।

অত্যাচার ? তোমার ওপর ?—মেয়েটি হেসে বললে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করেনা।

সত্যি বলছি।—এই ব'লে যত কিছু তাদের গোপনীয়, সমস্তই উদ্‌ঘাটন ক'রে সীতা পুনরায় বললে, তবে শোনো, আমি তখন মিছে কথা বলছিলুম, আমরা দু'তিন দিন উপবাসে আছি, রান্না আমাদের হয় না। কেমন ক'রে হবে বলোত ভাই ? একটি কানাকড়িও রোজগার করতে পারে না !

সে কি ! তবে তোমাদের চলে কেমন করে ?

উৎসাহিত হয়ে সীতা বললে, আর শুনতে চাও?—অনেক আছে। জুয়া খেলে কি আর রেখেছে কিছু? ওই ত, আমার জংলী শাড়িটা সেদিন বেচে দিয়ে এলো। ভেবেছে, না খেতে দিয়ে আমাকে মারবে? আমি কিন্তু ঠিক বেঁচে থাকবো, ভাই!—এই ব'লে সে হাসতে লাগলো।

চৌকাঠে ভর দিয়ে মেয়েটি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, হ্যাঁ, এসব অত্যাচার বৈকি। কিন্তু কই বাইরে থেকে কিচ্ছু জানা যায় না ত? ভদ্রলোকের অমন চমৎকার চেহারা! অমন স্বাস্থ্য—

সীতার মুখে আবার দীপ্তি দেখা গেল। কিন্তু অপর স্ত্রীলোকের মুখে তপনের রূপের সুখ্যাতি শুনেই তার রক্তাভ মুখ তৎক্ষণাৎ তীব্র হয়ে উঠলো। বললে, জানি, অনেকেরই লোভ আছে ওর ওপর।—এই ব'লে গম্ভীর ভাবে সে সেখান থেকে চ'লে গেল।

মেয়েটি তখন আঘাতে আর লজ্জায় একেবারে দিশাহারা। অবাক হয়ে কিছুক্ষণ নিশ্চলভাবে সে দাঁড়ালো, তারপর গলা বাড়িয়ে বললে, কি যেন ব'লে ফেললুম, কিছু মনে ক'রো না, ভাই। আচ্ছা, আসি।—এই ব'লে সে আবার সটান ওপরে উঠে গেল।

তার পথের দিকে উন্মাদিনী কেবল একবার ঘৃণাভরে তাকালো।

মাঝখানে একদিন এই রুগ্ন ঘিঞ্জী পল্লীর কোথায় কোন্ বাড়ীতে নারীকণ্ঠের সঙ্গীত শোনা গিয়েছিল। পাঁকের ভিতর থেকে পদ্ম যেমন ফুটে উঠে, তেমনি এই অস্বাস্থ্যকর রোগজর্জর দারিদ্র্য দৈন্যলাঞ্ছিত নোংরা বস্তির কোন্ প্রান্ত থেকে অপরূপ সঙ্গীতের মায়াজাল পল্লীবাসীকে কিছুকালের জন্য অভিভূত করেছিল। শ্রীকৃষ্ণ নেই বৃন্দাবনে, ব্রজপুরী অন্ধকার, শ্রীমতী অশ্রুমুখী চলেছেন ঝড় আর দুর্যোগে অভিসারে। গুরুজন আর দুর্জনের ভয় নেই, পথ বিপথ অজ্ঞাত, সর্পসমাকুল অরণ্য,- ঘন অন্ধকার পৃথিবী, শ্রীমতী চলেছেন পরম সন্ধানে।

কানাকানি খবর নিয়ে জানা গেল, তপন সারাদিন ঘরে ফেরেনি, এবং এই অপরূপ কণ্ঠের মধুর কীর্তন সীতার মুখ থেকেই উৎসারিত হয়েছিল। জানলার ফাঁক দিয়ে উপবাসিনীর কণ্ঠে সারাদিন অমৃতধারা নামছে। তার গানে সবাই মুগ্ধ।

•

কিন্তু একটি বিশেষ রাত্রে আবার এই অপরিচ্ছন্ন পল্লীর জীবনধারা আবর্তিত হয়ে উঠলো।

রাত দুটো বেজে গেছে। নারীকণ্ঠের চাপা আর্তস্বর আশেপাশে অনেকেই শুনতে পেয়েছিল। প্রসববেদনাগ্রস্ত কোনো মেয়ের গলার আওয়াজ মনে ক'রে প্রথমটা কেউ বিশেষ আমল দেয়নি। কিন্তু উৎপীড়িতার গোঙানির চেহারা

অন্যরূপ, মাঝে মাঝে প্রলাপোক্তির সঙ্গে প্রতিবাদের ভাষাও অনেকের কানে আসছিল। দেখতে দেখতে দু'একজন জেগেও উঠলো।

অত গভীর রাত্রে যত বড় রহস্যময় কাহিনীই হোক, অনড় নির্জীব স্ত্রী পুরুষরা পথে বেরিয়ে পাড়া সচকিত ক'রে তুলবে, এমন উৎসাহ বিশেষ কারো ছিল না। কিন্তু তবু ওরই মধ্যে দু'চারজন পুরুষ এবং বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক হাঁকাহাঁকি ক'রে এ-বাড়ী ও-বাড়ী সে-বাড়ী জাগিয়ে তুললেন। দেখতে দেখতে বাড়ীওয়ালা সপরিবারে ধড়মড়িয়ে উঠে চেঁচালেন, কোথায়, কে কাঁদে রে?

তারপর অনেকেই অবশ্য এসে দাঁড়ালো। ব্যাপারটা আর কিছু নয়, তপন আর সীতার পারিবারিক ঘটনা। তপন সেই রান্নার জায়গাটুকুতে একখানা চাদর পেতে চুপ ক'রে শুয়েছিল, জনতাকে দেখে সে উঠে এসে বললে, আপনারা কষ্ট ক'রে এসেছেন কেন, চ'লে যান্—এসব কিছু নয়।

কিন্তু তখন অবিরাম আর্তকণ্ঠ ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছে। একজন স্ত্রীলোক বললেন, কাঁদছে কেন, বলোই না, বাছা? আমরা পাড়ার লোক, আমাদের অশান্তি হয় না?

জনৈক যুবক বললে, স্ত্রীর ওপর বুঝি অত্যাচার করছেন?

তপন বললে, না, আমার ওপর উনি অত্যাচার করছিলেন তাই শাস্তি দিয়েছি। আপনারা চ'লে যান্।

এটা ভদ্দল্লোকের পাড়া, আমরা সকলে থাকতে মেয়েছেলের ওপর অত্যাচার সহ্য করবো না। কেন উনি কাঁদছেন আমরা জানতে চাই। এখনো ইংরেজ রাজত্ব যায়নি, এসব চালাকি চলবেনা, বুঝলেন ?

তোমার স্ত্রীকে ডাকোনা একবার, বাবা ?

ক্রোধে তপন কাঁপছিল। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বললে, ওপর থেকে আপনারা কিচ্ছু বুঝতে পারবেন না. আমি শান্তভাবে বলছি, দয়া ক'রে আপনারা চ'লে যান্।

বাড়ীওয়ালা খড়ম পায়ে হারিকেন লণ্ঠন হাতে নিয়ে এসে বললেন, তা কেমন ক'রে হবে ? আপনি যদি স্ত্রীকে খুন করেন, আমরা সহ্য করব ?

বাড়ীওয়ালার প্রশ্রয় পেয়ে আর সবাই মারমুখী হয়ে উঠলো। একজন প্রস্তাব করলেন, এখুনি পুলিশ ডাকো।

বলতে বলতেই জন দুই বেকার ছোকরা এবং একজন স্ত্রীলোক ভিতরে ঢুকে বললে, আমরা আপনার স্ত্রীর মুখেই শুনতে চাই, আপনি অত্যাচার করেছেন কিনা।

শোবার ঘরের দরজায় বাহির থেকে শিকল টেনে দেওয়া। একজন দরজা খুলে ফেললো। ভিতরে তখন সীতা ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। ঘরের সব জানালাগুলো বন্ধ ; বায়ুলেশহীন শ্বাসরোধী ঘরের অন্ধকারে বাড়ীওয়ালা হারিকেন লণ্ঠন নিয়ে ঢুকলেন। সবিস্ময়ে আতঙ্কে সকলেই দেখলো, নিচের

জানলার লোহার গরাদের সঙ্গে পিটমুড়ে দড়ি দিয়ে সীতাকে বাঁধা। তার ঘাড়ের সঙ্গে হাঁটু আর হাত পা দড়ি দিয়ে পাকানো। নড়বার সাধ্য নেই। ঘামে আর চোখের জলে মেয়েটার শ্বাসরোধ হবার উপক্রম। সকলে চীৎকার ক'রে উঠলো।

তারপরের দৃশ্যটা অনুমেয়। বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে বাইরে এনে সুস্থ করা হোলো। দরজা জানলা খুলে দিয়ে ছোকরা দুজন, বাড়ীওয়ালা, পাড়ার তিনটি স্ত্রীলোক, উপর তলার ছেলেমেয়েরা—সকলেই নানারূপ প্রশ্ন করতে লাগলো।

দাঁতে দাঁত দিয়ে তপন কেবল বললে, আপনারা কেউ চেনেন না ওকে। ও শয়তানী!

সীতা কাঁদতে কাঁদতে বললে, দেখলেন ত আপনারা, অমানুষিক অত্যাচার! এই দেখুন কালশিরের দাগ। রোজ মারে আমাকে। মার খাচ্ছি বহুদিন থেকে। খেতে দেয় না, পরতে দেয় না। একদিন ঘুমোচ্ছিলুম, সিগারেটের আগুন আমার গায়ে চেপে ধরেছিল! এমন নিষ্ঠুর—এমন—

তপন বললে, জানেন না আপনারা, কী সাংঘাতিক মেয়ে! ওর রক্তের মধ্যে পাপের বীজ, এমন বন্য বজ্জাত। এমন একটা কঠিন নির্দয় অজ্ঞান ওর মধ্যে···বেপরোয়া দুরন্তপনা। ওকে সভ্য সমাজে রাখা যায় না, পাগলা গারদে দেওয়া যায় না···

চারিদিকে অতগুলি স্ত্রীপুরুষ, কিন্তু নিঃসঙ্কোচকণ্ঠে আঁচলে চোখ মুছে সীতা বলতে লাগলো, একটু সংসারে মন দেবে না। ছবি আঁকবে-আর জুয়া খেলবে। চুপ করে শুয়ে থাকে সারাদিন, ক্ষিধে নেই, তেষ্টা নেই। সেদিন মুড়ি আনতে বেরিয়ে গেল, রাত্তিরে ফিরে এলো এক তোড়া ফুল নিয়ে।

তপন বলতে লাগলো, এমন কোথাও শুনেছেন আপনারা, হাসিমুখে ব'সে ব'সে ছুরি দিয়ে মেয়ে মানুষ নিজের হাতের মাংস কাটে, সেই রক্তে টিপ পরে? সেদিন চুপি চুপি কাগজ জ্বালিয়ে নিজের চুল পোড়াচ্ছে দেখতে পেলুম। জামা কাপড় বিলিয়ে দেয় রাস্তার লোক ডেকে। বলুন আপনারা, বলুন—বিচার করুন—

বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকটি সীতাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, কাল সকালে যা হোক একটা ব্যবস্থা হবে, আজ তুমি চলো মা আমার বাড়ীতে। আমার কাছে শোবে।

সীতা রাজি হোলো না। বললে, যেতে পারতুম, কিন্তু ভারি খারাপ লোক। একটা বদ্নাম রটিয়ে দেবে। আমাকে সন্দেহ করে কিনা।

তোমার মা বাপ নেই?

আছেন। তাঁরা খুব বড়লোক। আমি সেখানে যাইনে।

মহিলাটি বললেন, চলে যাওয়াই ত উচিত। তোমার ওপর এই সব জঘন্য অত্যাচার করে, আর তুমি ছেড়ে যেতে পারো না ?

সীতার মুখখানা তৎক্ষণাৎ দীপ্ত হয়ে উঠলো। কি যেন বলতে গিয়ে সে সহসা থেমে গেল। স্মিত রক্তাভ মুখ নত করে বললে, ছেড়ে যেতে পারিনে।

মহিলাটি বললেন, বুঝেছি, পাগলী মেয়ে। বিয়ে হয়েছে কদ্দিন ?

বিয়ে ! সীতা মুখ তুলে বললে, বিয়ে ত আমাদের হয়নি। আমরা চলে এসেছি।

তার সরল সহজ এবং অকম্প উক্তিতে মহিলাটি স্তব্ধ হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলেন।

রাত অত গভীর, সুতরাং গণ্ডগোলটা এক সময়ে থামাতেই হোলো। বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকটি ফিরে এসে আড়ালে বাড়ীওয়ালার স্ত্রীকে কি যেন কানে কানে বললেন, স্ত্রী স্বামীকে আড়ালে ডেকে বললেন কানে কানে, একজন ছোকরার কান আর একজনের কাছে সরে গেল। অবশেষে এ-কান ও-কান, তারপর সকল কানে, সকলখানে।

বাড়ীওয়ালা ঘোঁট পাকিয়ে নিভৃতে সবাইকে ডেকে বললেন, আচ্ছা, আজকে আর ওদের জানিয়ো না, খুঁচিয়ো না। কাল সকালে বাড়ী ভাড়াটি আদায় ক'রে বাছাধনকে

নারীহরণের দায়ে ফাঁসিয়ে দেবো। পুলিশ কি আর সহজে ছাড়বে? পাঁচটি বছর!

*　　*　　*

কিন্তু পরদিন বাড়ীওয়ালার চীৎকারেই সবাই ছুটে এলো। পুলিশে ধরিয়ে দেবার মতো উৎসাহ অতঃপর কারো ছিল কিনা বলা কঠিন, কিন্তু সকালে উঠে তপন আর সীতাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। ঘর তাদের শূন্য—ছেঁড়া চটের থলে ছাড়া সে ঘরে আর কিছু নেই। ভোর রাত্রেই তারা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

বাড়ীওয়ালা চীৎকার করে বলতে লাগলেন, দুজনেই সমান, দুজনেই জোচ্চোর। এগার টাকা হিসেবে বাইশ দিনের ভাড়া আট টাকা চার পাই আমার মেরে দিয়ে গেল, মশাই? সর্বনাশ হোক তোদের, সর্বনাশ হোক!

কিন্তু সর্বনাশ তাদের হয়েছিল কিনা সে খবর আর পাওয়া যায়নি। তারপর অনেক দিন পেরিয়ে গেছে। নিচের ঘরটা খালিই পড়ে রয়েছে। কুকুরটা রোজ সন্ধ্যার পর আবার ওখানে আসে। অন্ধকার কোটরে শুয়ে-শুয়ে বোবা নির্বোধ দৃষ্টিতে প্রকাণ্ড প্রশ্ন বিস্ফারিত করে নিঃশব্দে চেয়ে থাকে।

তাসের ঘর

বিহারের কোনো একটি স্বাস্থ্যকর অঞ্চলে সেবার অনেকগুলি পরিবারের আবির্ভাব ঘটেছিল। সকলেই বাঙালী এমন নয়, বেশি দামের বাড়ী ভাড়া নিয়ে দুই এক ঘর ভদ্র হিন্দুস্থানী পরিবারও আশেপাশে এসে উঠেছিলেন। শহরটি ছোট, কিন্তু নাম ডাক আছে। এখানকার ইদারার জলে নাকি ধাতব পদার্থ অনেক বেশি, বিশেষ চূণ আর লোহা, বাঙালীর অন্ত্রে তন্ত্রে এ দুটোর দরকার নাকি প্রচুর! দ্বিতীয় কারণ হোলো, শহরের বাড়ীগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং একটির থেকে আর একটি অনেক দূরে—মাঝখানে মসৃণ প্রান্তর, দূরে দূরে পথগুলি আঁকাবাকা। আরো দূরে বনময় উপত্যকা। বাতাসটি লঘু, স্বাস্থ্যকর এবং অগ্নি উদ্রেককারী। আসল কথা, অম্ল অজীর্ণ না থাকায় বাঙালীর কাছে এ অঞ্চল খুবই প্রিয়, এবং এখানকার নিরিবিলি অবকাশ যথেষ্টই আরামদায়ক।

শোন নদী এখান থেকে বেশি দূরে নয়। পাটনা, কিউল, ভাগলপুর ইত্যাদি শহর থেকে প্রায়ই এদিকে বড় বড়

বজরা আসে ; মহাদেওগঞ্জের মন্দির দর্শনে, শোনপুর মেলায় —এই পথ দিয়ে যাত্রীরা চলাচল করে। মাঝপথে হাটতলা, হনুমানপুর, দরিয়াগঞ্জ প্রভৃতি নানা জায়গা আছে।

এই জলপথ দিয়েই কয়েকদিন পূর্বে চৌধুরী সাহেব একখানা বড় দরের বজরা ভাড়া ক'রে সস্ত্রীক এসে এখানে একটি বাড়ীভাড়া নিয়েছিলেন। স্ত্রীর স্বাস্থ্যও ভালো, শরীরও ভালো, কিন্তু মাঝে মাঝে মাথাধরার ব্যারাম আছে। ডাক্তার বলেন, নদীর খোলা বাতাস রোগীর পক্ষে খুবই স্বাস্থ্যকর হবে।

আভাবতী প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিল, কলকাতা ছেড়ে গেলে মাথাধরাও ছেড়ে যাবে। অত টাকা খরচ ক'রে নৌকা ভাড়া ক'রে কাজ নেই।

সে কখনো হয়, তুমি বলো কি ?—চৌধুরী সাহেব ব্যস্ত হয়ে বললেন, মাথার সঙ্গে সমস্ত দেহের যোগ। মাথাই ত সব। টাকা সামান্য, কিন্তু শরীরটা সামান্য নয়, আভা।

আভা বললে, এখানকার জল হাওয়াতেই সব সারতে পারতো। ট্রেনে এলে এতে খরচ মোটেই হোতোনা।

কথাটা সত্য, কিন্তু চৌধুরী সাহেব সেকথায় কান দেননি। স্ত্রীর স্বাস্থ্যের সংবাদ স্ত্রীর অপেক্ষা তিনিই বেশি জানেন ; স্ত্রীরা স্বামীর ব্যয় সঙ্কোচ করতে চায় নিজের অসুবিধা সত্বেও।

চৌধুরী সাহেব বলেছিলেন, তোমার মন প্রফুল্ল থাকার ওপর আমার ভ্রমণের আনন্দ নির্ভর করছে। আমার অস্বস্তি তোমাকে বোঝাতে পারবোনা আভা,—তোমার শরীর আর মন ভালো থাকাটাই হোলো আমার সব কাজের উৎসাহ।

তাদের ছোট বাড়ীটি মাঠের মাঝখানে হোলেও আশেপাশে প্রতিবেশীদের বাগানের সীমানা। পূর্বদিকে দূরে শোন নদী, সুতরাং ভোর হ'তে না হ'তেই রাঙা সূর্যের আলো এসে একেবারে শোবার ঘরের মধ্যে পড়ে। অক্টোবরের প্রথম কিন্তু এরই মধ্যে মাঠে মাঠে শিশিরবিন্দু ঝলমল করে। নদীর বালুচরের উপর প্রভাত সূর্যের দীপ্তি এখান থেকেই চোখে পড়ে। প্রাতঃভ্রমণ শেষ ক'রে স্বামী-স্ত্রী যখন ফিরে আসে, তখন আশেপাশে পল্লীবাসীরা জেগে ওঠে।

কলকাতা থেকে সেন পরিবাররা এসেছিল। কিন্তু বিদেশে এসেও ওরা কলকাতার অভ্যাসগুলো ভুলতে পারেনি! সকাল সন্ধ্যা বারান্দাতেই বৈঠক বসায়, ভ্রমণের কোনো উৎসাহ প্রকাশ করে না। মেয়েরা অভ্যাস মতো ঘরের কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকে, পুরুষদের ফাই ফরমাস খাটে, সেবাই করে,—কিন্তু শরীরের দিকে তাদের কোনো নজর নেই। স্বাস্থ্য ফেরাতে এসেও অভ্যাসের দাসত্ব করতে ওরা ভোলেনি। সেই রান্না আর বাসন মাজা, সেই সারাদিন

গৃহস্থালীর চক্রান্তে ঘুরপাক খাওয়া,—আনন্দ করবার কোনো অবকাশ নেই।

আভা বললে, কি করবে বলো, খাওয়া দাওয়া ত সঙ্গে সঙ্গেই যায়।

যায় জানি—চৌধুরী বললেন, কিন্তু কেন? কেন ওই ষোড়শ উপচারে ভোজনের আয়োজন। একথা জানা উচিৎ, বিদেশে আহারের ব্যবস্থা সরল হওয়া দরকার,—তোমাকে যদি ওই সব নিয়ে ব্যস্তই থাকতে হোলো, তোমার রিলিফ কোথায়? তোমার শরীরের উন্নতি হবে কেমন ক'রে? ছিছি, ওরা কী অত্যাচার করে বলো ত ওদের মেয়েদের ওপর? নিজেরা স্ফূর্তি করে, তাস খেলে,—আর মেয়েরা খাটে ঝিয়ের মতন! ঘর থেকে বেরিয়ে ঘরেই এসে ঢুকলো,—মেয়েদের ওপর কতখানি অবিচার হচ্ছে, তুমিই বলো ত আভা?

চৌধুরী সাহেব একটু খুঁৎখুতে সন্দেহ নেই। স্ত্রীর সুবিধার জন্য তিনি আগেই তাঁর পাচককে ট্রেন যোগে পাঠিয়েছেন, দু'জন চাকর এসেছে তাঁর সঙ্গে। এখানে এসে ফুলবাগান রক্ষা করার জন্য তিনি এক স্থানীয় মালীকে মোতায়েন রেখেছেন। আহারাদির আয়োজন ব্যাপারে আভাকে বিন্দুমাত্র পরিশ্রম করতে হয় না। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি হাতের কাছে তিনি সমস্তই পান, অভিজ্ঞ পাচক

আর চাকর কোনো ত্রুটি অথবা অভাব রাখেনা। এখানে এসে কেবল মাত্র ভ্রমণ, স্বচ্ছ জীবনধারা, নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ আর আনন্দ,—স্ত্রীর প্রতি এই হোলো প্রত্যেক স্বামীর কর্তব্য। বাঙলা দেশের মেয়ে চিরকাল স্বামীদের হাতে অনেক উৎপীড়ন সহ্য ক'রে এসেছে, অন্তত এই শরীর রক্ষার ব্যাপারে,—তার হাতে অন্ততঃ সে-সব লাঞ্ছনা আর না ঘটে। এ সম্বন্ধে চৌধুরী সাহেবের যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ ছিল। তিনি, আর যাই হোক, নিরানব্বই জন স্বামীর একজন নয়।

আচ্ছা, দেখেছ তুমি লক্ষ্য ক'রে—তিনি একদিন বললেন, ওই যে চাটুয্যের স্ত্রী, কি রকম যা তা কাপড় প'রে রাস্তায় বেরোয়। আমার স্ত্রী হ'লে আমি সুইসাইড করতুম। আর চাটুয্যেও তেমনি, বিন্দু মাত্র সুরুচি বোধ নেই, সৎশিক্ষা নেই,—যাকে বলে কিম্ভূতকিমাকার।

আভা হাসিমুখে বললে, তোমার চোখ যদি কিছুতে এড়ায়! হয়ত বেচারীদের তেমন অবস্থা নেই?

নেই?—চৌধুরী সাহেব বললেন, সেকেণ্ড ক্লাসে ওরা এসেছে, তা জানো? আমার ওপর টেক্কা দিয়ে। চাটুয্যে ত টিন-টিন সিগারেট ওড়ায় দেখি। স্ত্রীর জন্যে একখানা শাড়ী কিনতে পারেনা? কেবল কি চাটুয্যে,—ওই ছাখো না কল্‌কাতার বিখ্যাত বোস পরিবার! বড় মেয়েটা হিল্ তোলা জুতোয় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে, আচ্ছা—দে না বাপু একজোড়া

স্যাণ্ডাল কিনে! এতই যদি বড় মান্‌ষী, মেয়ের জন্যে আর দুটো টাকা খরচ করতে পারিসনে? ছেলে দুটোর ত এক-জোড়া হাফপ্যাণ্টও জোটেনা! বনেদী বংশ বললে কি হবে, নজর বড় ছোট।

স্বামীর মুখ থেকে অন্যের প্রতি কটু মন্তব্য এবং সমালোচনা এইভাবে আভাকে শুনতেই হয়। একথা মিথ্যে নয়, তারা একটি সুখী পরিবার। বাস্তবিক, অভাব তাদের কোথাও কিছু নেই। সঙ্গে তাদের একটা দামী গ্রামোফোন আছে। চৌধুরী সাহেবের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যহ প্রভাতে চাকর সেটা বাজায়। ভজন অথবা কীর্তন গানের সুরে আভার ঘুম ভাঙে। সকালে পাখীর কলকূজনে মাঠ ভ'রে ওঠে। মালী এসে ফুলদানীতে টাট্‌কা সূর্যমুখী অথবা চন্দ্রমল্লিকা রেখে যায়। কয়েকটা গাছে গোলাপ ধরতে আর দেরী নেই।

কাছাকাছি কয়েকটি পরিবার থাকা সত্বেও চৌধুরী সাহেব এখানে এসে অবধি কারো সঙ্গে বিশেষ আলাপ করেন নি। সকলের সঙ্গে গলাগলি করা তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তাঁর শিক্ষার পরিমাপের সঙ্গে ওদের মাখামাখি মেলেনা, সুতরাং দূরত্ব একটু রেখে তাঁকে চলতেই হয়। আর না রেখেই বা উপায় কি? মহৎ আভিজাত্য সব সময়েই আত্মকেন্দ্রীক, বারোয়ারী হাটে সে যদি না নেমে আসে তবে তাকে দোষ দেওয়া চলেনা, তার রীতিনীতিই আলাদা।

সেদিন ওদের এই আলাপই চলছিল। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর অবধি ওরা চলে এসেছে। সন্ধ্যা হ'তে আর বিলম্ব নেই, শোন নদীর জল রাঙা হয়ে এসেছে। কয়েকটা মহাজনী নৌকার ছইয়ের মধ্যে ছোট ছোট কেরোসিনের ডিবে জ্বলে উঠেছে। শরতের আকাশ দেখতে দেখতে ম্লান হয়ে এলো। এদিকটা চৌধুরীর ভালো লাগে না। তাঁর বিবাহিত জীবনের চার বছরে স্ত্রীকে নিয়ে নিঃসঙ্গ থাকতেই ভালো লাগে। সন্তানাদি এখনো হয়নি। একটা বটগাছের নীচে নরম ও ঘন ঘাসের উপর দুজনে এসে বসলো। আজ অনেকটা পথ হাঁটা হয়েছে। যদি তাঁদের ফিরতে দেরী হয় তবে চাকর একটা টাঙা এনে হাজির করবে, বলা আছে।

দিগন্ত বিস্তৃত নদীর ওপার থেকে শুক্লপক্ষের চন্দ্র উপরে উঠে এসেছে। বাতাসটি লঘু, চোখে মুখে কেমন যেন নেশার রঙ বুলিয়ে চ'লে যায়। আজ আভাকে খুব ভালো লাগছে: নির্জন নদীর তীরে জ্যোৎস্নার মধ্যে নিয়ে এলে স্ত্রীও যেন কেমন মোহিনীর বেশ ধরে। কাছে থাকলেও যেন তার সর্বাঙ্গে একটা সুদূর রহস্যের ছায়া নেমে আসে, মাদক রসে মন টলমল করে।

আভা উচ্চশিক্ষিত না হ'লেও তার কোনো ক্ষতি ছিলনা। লেখা পড়ায় ভালো ছাত্রী ব'লে তিনি আভাকে বিবাহ করেননি, করেছেন তার রূপ দেখে। বিলাতের মোহ তাঁর

মনে ছিল, স্বাধীন সুন্দরীদের সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা যে একেবারেই নেই তা নয়,—কিন্তু তাদের মোহ থেকে তিনি উত্তীর্ণ হ'তে পেরেছেন কেবল মাত্র আভার পরিচয়ে। আর যাই হোক, আভা তাঁর জীবনে কোনো অভাব রাখেনি। বয়সকালের যে ঐশ্বর্যভার ছিল আভার সর্বাঙ্গে, তার সম্পদ অপরিমেয়। অথচ তার চাঞ্চল্য নেই। ভাদ্রের নদী ভরো-ভরো, কিন্তু দুরন্ত স্রোতে সে মাতিয়ে তোলেনা,—কেমন একটি প্রশান্ত আবেদন ছিল তার চেহারায়। চৌধুরীর মন নিবিড় আনন্দে অবগাহন করতো।

আভা?

আভা উত্তর দিল, কি গো?

চৌধুরী একখানা হাতে স্ত্রীর গলা জড়িয়ে বললেন, আচ্ছা. এখান থেকে তুমি আর কোথায় যেতে চাও বলো।

আভা বললে, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে।

হ্যাঁ, আমার এখনো অনেক দিন ছুটি। আরো প্রায় দেড় মাস তোমাকে নিয়ে বেড়াতে পারি। আমরা দিল্লী আগ্রা হয়ে রাজপুতানায় ঘুরে আসবো, কেমন?

বেশ ত।

তুমি যে বলেছিলে, সব দেশের শাড়ী এক একখান কিনবে, মনে নেই?

হাসি মুখে আভা বললে, পাগল আর কি, বলেছিলুম

ব'লেই কি আর কিনবো? অত খরচ ক'রে দরকার নেই।

না, না সে হবে না। তুমি কেবল আমার অসুবিধের কথাই ভাবো, আনন্দের কথা ভাবো না।—চৌধুরী সাহেব বলতে লাগলেন, তুমি যদি জানতে তোমার নতুন নতুন সাজ-সজ্জায় আমার কত উল্লাস, তবে, তুমি একথা বলতে না।

আভা তার উত্তরে কেবল তার কোমল একখানি হাতে স্বামীর চুলের মধ্যে আঙ্গুল বুলিয়ে দিতে লাগলো। তারপর মধুর মৃদুকণ্ঠে বললে, শাড়ী না থাকলে তোমাকে বলতুম,—কিন্তু আমার অনেক আছে।

তুমি কি ভাবছো, আভা?

ভাবছি আসবার সময় তোমার ছোট বোন দুটো পশমের গোলা চেয়েছিল, কিন্তু ভুলে দিয়ে আসতে পারিনি। ভারি লজ্জার কথা।

চৌধুরী উত্তেজিত হয়ে বললেন, তার জন্যে কিছু লজ্জা নেই। তুমি কেন দেবে? কেন তুমি বেপরোয়া খয়রাৎ করবে?

আভা বললে, সামান্য জিনিষ ত!

না সামান্য নয়, আভা। তোমার যদি কখনো অভাব হয়, কেউ দেবে না তোমাকে। তোমাকে দোহন করাই সকলের কাজ। ওরা সবাই তোমার সৎব্যবহার আর মধুর স্বভাবের সুবিধে নিয়ে তোমাকে শোষণ করে। একটুও অন্যায় তুমি

করোনি, কারুকে কিছু দিয়ো না; মানুষকে হাতে রাখতে যদি চাও তাহলে তার লোভের উপকরণ হাতের মধ্যে রেখো—তবেই কাজ হবে। বরং দানের ভান ভালো, কিন্তু দান ক'রে ফতুর হওয়া কাজের কথা নয়।

স্বামীর সঙ্গে তার চার বছরের পরিচয়, সুতরাং এই অদ্ভুত যুক্তি শোনা আভার পক্ষে নতুন নয়। সে চুপ ক'রে রইলো।

কতক্ষণ উভয়ে নীরব। চাঁদের আলো নিবিড় হোলো, জ্যোৎস্না হোলো ঘন। চৌধুরী তাঁর নিজের কোলের উপর আভার মাথা টেনে নিলেন! তারপর তার গায়ের উপর একখানা হাত রেখে বললেন, বিদেশে নির্জন জায়গায় তোমাকে আনলে কী যে ভালো লাগে! তুমি শুয়ে আছ, এই গাছের তলাটাই যেন আমার স্বর্গ। চাঁদের আলো পড়েছে তোমার শরীরে, যেন রূপ-কথার পরির মতন মনে হচ্ছে। নিজের সৌভাগ্য দেখে. মনে হয়, বাঙলা দেশের আর সব স্বামীই দুর্ভাগা। আচ্ছা আভা—?

কি বলো?

তোমাকে কি আমি সুখী করতে পেরেছি?

সুন্দর হাসি হেসে আভা বললে, এতদিন পরে এ কথা কি বলতে আছে?

চৌধুরী বললেন, আমাকে কি তুমি সত্যই ভালোবাসতে পেরেছ, আভা?

আভা কেবল তাঁর দেহালিঙ্গন ক'রে বললে, মুখে কি জানাতে আছে ?

চৌধুরী সাহেব কেবল হেঁট হয়ে স্ত্রীর অধরে একটি চুম্বন করলেন। আভা কেবল চোখ বুজে রইলো।

জ্যোৎস্নার আলোয় দূর থেকে একখানা টমটম আসতে দেখা গেল। চাকরটা গাড়ী এনেছে সন্দেহ নেই। আভা তাড়াতাড়ি উঠে বসলো। হাসিমুখে বললে, ইস, অনেক দেরী হয়ে গেছে, এর পর তুমি চা খাবে কখন্ ?

চৌধুরী ক্ষেদোক্তি করে বললেন, চাকর বেটা সব মাটি ক'রে দিল। এমন সুন্দর রাত।

বাসায় যখন দুজনে ফিরলো তখন বেশ রাত হয়েছে। সন্ধ্যার দেওয়া ধূপের গন্ধ তখনো ঘর থেকে সব মিলোয়নি। ঘরে আলো জ্বলছে। তাদের ফিরতে দেখে চাকরটা গ্রামোফোনে একটি আশাবরী গানের রেকর্ড ধরে দিল। পাচক চা তৈরী করতে গেল।

বিকালের ডাকে কোনো চিঠিপত্র আছে কি না খোঁজ নেবার জন্য চৌধুরী টেবিলের কাছে গিয়ে দাড়ালেন। না, চিঠিপত্র তাঁর নেই। কিন্তু সহসা আর একটি চিঠির দিকে চোখ পড়তেই তিনি চমকে উঠলেন। এই চিঠি তিনি লিখে-ছিলেন তাঁর আফিসের বড় সাহেবকে। কিন্তু চিঠিটি ডাকে দেওয়া হয়নি দেখে ভয়ে তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে এলো। সাহেব

যাচ্ছেন টুরে, আজকে চিঠি ডাকে না দেবার জন্য যথাসময়ে এ চিঠি সাহেবের হাতে আর পৌঁছবে না। সর্বনাশ!

তিনি উচ্চ কণ্ঠে ডাকলেন, রামবিরিজ?

হুজুর।—ব'লে চাকর এসে দাঁড়ালো।

শুয়োর, আজকের ডাকে এ চিঠি যায়নি কেন?

মাইজী নেহি দিয়া, হুজুর।

বোলাও মাইজীকো, হারামি কাঁহেকা।

মাইজীকে খবর দিয়ে রামবিরিজ গা ঢাকা দিল।

আভা এসে ঘরে ঢুকলো। বললে, কি হোলো গো?

চৌধুরীর মুখখানা তখন দপদপ করছিল। বললেন, এ চিঠি ডাকে দেওয়া হয়নি কেন, আভা?

ও মা, তাইতো, যা—ভুলে গেছি!

কিন্তু তোমার ভুল করার মানে জানো? মিছে কথা ব'লে চলে এসেছি, সাহেবকে জানাচ্ছি খুব আমার অসুখ,—সঙ্গে পাঠাচ্ছিলুম ডাক্তারের সার্টিফিকেট।

আভা অপ্রস্তুত হয়ে বললে, ভারি ভুল হয়ে গেছে!

তোমার এই ভুলের মানে হোলো এই, এখানকার বাসা উঠিয়ে দু'দিনের মধ্যেই আমাদের চ'লে যেতে হবে। কত আশা ক'রে এসেছিলুম!

আভা বললে, আমার শরীর ত এখন ভালই আছে। বেশ ত, চল ফিরে যাই।

কিন্তু তোমার ভুল আজ নূতন নয়, আভা—চৌধুরী একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, সে'বার তোমার সামান্য ভুলের জন্য আমার কি ক্ষতি হয়েছিল, মনে পড়ে ?

আভা মুখ তুলে বললে, ক্ষতি তোমার হয় নি, কিছু অসুবিধা হয়েছিল মাত্র।

কিন্তু অসুবিধাই বা হবে কেন তোমার জন্যে ?

সংসার করতে গেলে ভুলচুক একটু-আধটু হয়েই থাকে। তোমার এ চিঠি যে বিশেষ দরকারী—কই, আমাকে ত সকালে বলনি ?

বলিনি, সে আমার খুশি। তোমাকে সব কথাই বলতে আমি বাধ্য নই। চিঠি তোমাকে ফেলতে বলেছিলুম, এই যথেষ্ট। সেই কর্তব্য তুমি পালন করোনি, এই হোলো অভিযোগ।

আভা বললে, বাজে ধমক দিও না, চিঠি ফেলা হয়নি, এটা দৈবাৎ। তুমি নিজেই কোন্ চিঠি ফেলার ব্যবস্থা করলে ?

চৌধুরী উচ্চকণ্ঠে বললেন, আমি নিজে ? তুমি তবে আছ কি জন্যে ?

আমি কি জন্যে আছি তা তুমি বেশ জানো। এ নিয়ে খোঁটা শুনিওনা।

আমার ক্ষতি হোক এই কি তুমি চাও ?

আভাও উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললে, আমি কি চাই না চাই সে কথা শুনে লাভ নেই তোমার।

চৌধুরী বললেন, কেন লাভ নেই শুনি? তোমার মতলব কি? কী না করেছি তোমার জন্যে?

যা কিছু করেছ, নিজের জন্যই সব! নিজেকেই খুশী করবার জন্যে, নিজেরই স্বার্থের জন্যে। বেশী কথা ব'লোনা—থামো।

টেবিলটা চাপড়ে চৌধুরী চীৎকার ক'রে বললেন, এমন নির্লজ্জ মেয়েমানুষকে আমি বিয়ে করেছিলুম,—তুমি অতি নীচ প্রকৃতির স্ত্রীলোক।

তুমি তার চেয়েও নীচ,—আভাও চেঁচিয়ে উঠলো—ভদ্রতা কা'কে বলে তা তুমিও জাননা। সামান্য ভুলের জন্যে কোনো স্বামী এই ভাবে ঝগড়া করে না।

সামান্য তোমার কাছে, আমার কাছে নয়।

আমার প্রতি তোমার ঘোর উপেক্ষা, গভীর অশ্রদ্ধা।

আভা বললে, বেশ, এর বেশী শ্রদ্ধা আমার নেই। তুমি যা খুশী তাই করতে পারো।

চৌধুরী পায়চারী করতে করতে বললেন, জানি তোমার এই স্পর্ধাকে কেমন ক'রে শাসন করতে হয়!

আভা বললে, জব্দ করতে তুমি কম চেষ্টা করোনি। আমিও তোমার সব চাতুরী জানি। তোমার কোনো তোষা-মোদে আমি ভুলিনে।

চৌধুরী বললেন, সাবধান আভা, সাবধান ব'লে দিচ্ছি!

ভয় দেখিয়োনা, যথেষ্ট সাবধানে আছি! চোখ-লাল করতে হয়, চাকরদের কাছে করোগে।

তোমাকেও তাদের চেয়ে বড় ক'রে দেখিনে।—চৌধুরী চীৎকার করতে করতে বললেন, পায়ের জুতোকে কখনো মাথায় তুলতে নেই। রূপের অহঙ্কার, কেমন? অমন রূপ দু' টাকা খরচ করলে কল্‌কাতায় কিনতে পাওয়া যায়। ইতর মেয়ে মানুষ! পারিনে? খুব পারি। খুব পারি তোমাকে সায়েস্তা করতে। দয়া করতে নেই তোমাদের,—সাপকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই।

পাড়ার লোক কয়েকজন বাগানের ফটকের কাছে এসে জড়ো হয়েছিল। জানালা দিয়ে তাদের লক্ষ্য ক'রে চৌধুরী সাহেব বেরিয়ে এলেন। গলাবাজি ক'রে তখনো তিনি খব দাঁপাচ্ছিলেন।

গেটের কাছে এসে তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কী চান্ আপনারা?

একটি ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, আমরা পাশেই থাকি। বিদেশ জায়গা, গলার আওয়াজ শুনে ভাবলুম, বুঝি কোনো বিপদ আপদ ঘটেছে আপনার এখানে। তাই ছুটে এলুম।

মিছে কথা আপনাদের!—চৌধুরী সাহেব চড়াও হয়ে বললেন, এটা আপনাদের বাঙ্গালীপনা। স্বামী-স্ত্রীতে কথা

কাটাকাটি হচ্ছে, তাই আপনারা তামাসা দেখতে এসেছেন ! আপনাদের লজ্জা করেনা ? আপনারা না ভদ্রলোক ?

ভদ্রলোকেরা বিমূঢ় স্তম্ভিত হয়ে বললেন, আচ্ছা, আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা যাচ্ছি।

যান, নিজেদের ঘর সামলানগে।—এই ব'লে দ্রুতপদে ফিরে এলেন।

ঘরে এসে দেখলেন, আভা শ্রান্ত হয়ে বিছানায় আড় হয়ে পড়েছে। চৌধুরী বললেন, শালাদের দিয়েছি ঠাণ্ডা ক'রে,—অভদ্র ইতর কোথাকার। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমি ঝগড়া করবোনা, তবে কি তোদের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করতে যাবো ? —ও কি, কি হোলো তোমার ?

চৌধুরী স্ত্রীর কাছে গিয়ে হেঁট হলেন। আভা তখন চোখ বুজে চুপ ক'রে প'ড়ে রয়েছে। তাড়াতাড়ি একটু জল এনে স্ত্রীর কপালে বুলিয়ে তিনি বললেন, মাথাটা বুঝি আবার ধরেছে, আভা ?

আভা বললে, হুঁ।

দেখলে ত, আমি জানি তোমার শরীর খারাপ। এই জন্যেই ত ছুটি নিতে চাইছিলুম।—এই ব'লে একহাতে স্ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে অন্য হাতে চৌধুরী সাহেব তাকে বাতাস করতে বসলেন।

আচার্যিদের বউ

ভূমিকা কেঁদে আচার্য মহাশয়ের পরিবারের পরিচয় দেবার কিছু দরকার নেই। কিন্তু একথা যদি বলি, নাস্তিত্ববাদ, অশ্রদ্ধা আর সংশয়ের এই যুগে এমন একটিপরিবার অভিনব, তাহ'লে অনেকেই হয়ত অবাক হবেন। মানুষ আজ আত্ম-রচিত বিজ্ঞান-সভ্যতায় উৎপীড়িত হচ্ছে, নিজের সৃষ্টি-করা মারণাস্ত্রের ভয়ে মাটির তলায় গিয়ে প্রবেশ করছে। অশান্ত জীবনের একমাত্র স্বস্তি ছিল শূন্যময় ঈশ্বর, কিন্তু সেখানেও অসংখ্য যন্ত্র-শকুনের পাল ঈশ্বরকে ডানা দিয়ে ঢেকে মানুষকে মারছে তাণ্ডব-দাহনে। মেঘলোক থেকে বিদ্যুৎকে ছিনিয়ে যে-সভ্যতার আলো সে জ্বালিয়েছিল ঘরে ঘরে, দেশ-দেশান্তরে, —সেই আলো প্রাণভয়ে নিবিয়ে সে ঢুকলো সুড়ঙ্গপথে। বিশ্ববিধানের ভার যাদের হাতে, আত্মদলনে আর আত্মাব-মাননায় তারা মুমূর্ষু। এই অশান্ত জীবনে যদি কোনো ব্যতিক্রম দেখি, চমকে উঠি।

জানি, আচার্য পরিবারের আলোচনায় একথার দাম নেই, তবু এই বিংশ শতাব্দীর বিষে জর্জরিত কলকাতা নগরের ঠিক

মাঝখানে এমন একটি নিরুদ্বিগ্ন সম্ভ্রান্ত পরিবার বিস্ময়ের বিষয় বৈ কি! বাংলার একটি অতি প্রাচীন গুরুবংশের ধারা তাঁরা বজায় রেখে চলেছেন—যেমন ভগীরথ শাঁখ বাজিয়ে যান্ গঙ্গার আগে আগে উষর জনপদ আর প্রান্তর পেরিয়ে। পৃথিবী প্রগতিশীল এ-সংবাদ তাঁদের জানা নেই; সংস্কৃত ছাড়া আর কোনো ঐশ্বর্যশালিনী ভাষা আছে এ তাঁরা বিশ্বাস করেন না। আশ্চর্য বৈ কি! সকাল সন্ধ্যা পূজাপাঠ, গঙ্গাস্নান, বেদমন্ত্র-ধ্বনি, আরতি, নারায়ণসেবা, পৌরাণিক আলোচনা—এ পরিবারের এইটিই নিত্যকর্ম বংশানুক্রমায়। এর মধ্যে কোনো ভাঙন নেই, ব্যতিক্রম নেই, সংশয় অথবা আলস্য ঢুকে কোনদিন এখানে প্রশ্রয় পায়নি। কঠিন, নিরেট, নিরুদ্ধ দেওয়াল এই পরিবারকে পৃথিবীর কলরোল থেকে চিরকালের জন্য আড়াল ক'রে রেখেছে। এখানকার সর্বশেষ শিশুটি অবধি এই শিক্ষায় আর এই দীক্ষায় বনবল্লীর মতো নিভৃতে বেড়ে উঠেছে। অথচ সমস্তটাই সহজ, সাবলীল, প্রসন্ন—কোথাও শাসন নেই, সতর্কতা নেই। যেন কল্‌কাতার তৃষাদগ্ধ মরুভূমির মাঝখানে অরণ্য ছায়াময় একটি প্রাচীন সরোবর।

এমন্ একটি পরিবারে সেদিন যে বিবাহটা ঘট্‌লো সেটা কিছু অভিনব। বিবাহের ইতিহাসটুকু সামান্যই। আচার্য মহাশয়ের ছাত্র দেবগ্রামের কেশবচন্দ্রের কন্যা মল্লিকার সঙ্গে আচার্য তাঁর নাতির বিয়ে দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। কি

কারণে এই প্রতিশ্রুতি সেকথা এখানে ওঠেনা। প্রতিশ্রুতি —এই যথেষ্ট। কিন্তু এই সত্য আচার্যকে রক্ষা করতে হোলো বহুমূল্যে—কারণ তাঁর পরিবারে বাল্যবিবাহ যেমন চিরকালীন প্রথা, তেমনি পাত্রীর পক্ষে লেখাপড়া শেখাও তাঁদের বংশের সংস্কার-বিরুদ্ধ। সত্যাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ কিন্তু দ্বিরুক্তি না ক'রে শিক্ষিত মেয়ের সঙ্গে নাতি হরিমোহনের বিয়ে দিলেন। মল্লিকার বয়স তখন বাইশ পেরিয়ে গেছে। হরিমোহনের পঁচিশ। সমগ্র পরিবার উৎকট অস্বস্তিতে স্তব্ধ হয়ে রইলো।

বলা বাহুলা, যৌথ পরিবার হ'লেও আচার্যদের অবস্থা খুবই সচ্ছল। দাসদাসী সমেত দুবেলায় প্রায় দেড়শো পাত পড়ে। আগেকার আমলের গৃহসজ্জায় সমস্ত বাড়ীটা পরিপূর্ণ। পুরনো কালের পিতল-কাঁসার বাসনপত্রগুলো দেখলে বাঙ্গালীর আদি ইতিহাস মনে পড়ে। বাড়ীতে সবশুদ্ধ কতজন স্ত্রী-পুরুষ এবং কা'র সঙ্গে কি সম্পর্ক—মল্লিকা আজ অবধি থৈ পায়নি। সে ঘুরে ঘুরে ঘরে ঘরে বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলো। তাকে দেখে বৌ-ঝিরা অনেকেই মাথার কাপড় টেনে দিল, ছেলেরা আড়ালে চ'লে গেল এবং কুমারী মেয়েরা চেয়ে রইলো অবাক্ হয়ে। প্রথমটা মল্লিকা কৌতুক বোধ করলো, কারণ কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে এগিয়ে আসে না। পরে, অনেকক্ষণ বাদে, সে নিজের মহলে এসে আবিষ্কার করলো,

পায়ে তার চটিজুতো ছিল—ওরা তাই শিউরে উঠে গা-ঢাকা দিয়েছে। মল্লিকা অস্বস্তিবোধ করতে লাগলো।

নতুন স্বামী-স্ত্রীর আলাপ কি ভাবে আরম্ভ হয়, সে তারা নিজেরাই শেখে। সে অবস্থাটা দুজনেই পেরিয়ে এসেছে। স্বল্পভাষী বিনয়ী হরিমোহন সেদিন ঘরে ঢুকতেই মল্লিকা বললে, স্নান ক'রে আসা হোলো, মাথা আঁচ্ড়ানো হোলো না?

হরিমোহনের মুখখানি নধর, সুন্দর। এই পরিবারে প্রিয়দর্শন ব'লে তার খ্যাতি। হাসিমুখ তুলে তাড়াতাড়ি সে হাত দিয়ে মাথার চুল বার বার নিচের দিকে নামিয়ে দোরস্ত করতে লাগলো।

মল্লিকা বললে, ওকি, হাত দিয়ে কি মাথা আঁচড়ানো যায়?—এই ব'লে নিজের আলমারির ড্রয়ায় থেকে চিরুণী আর ব্রাশ বা'র ক'রে দিল।

হরিমোহন হেসেই অস্থির। বললে, না না, এখন আহ্নিকের সময়, চিরুণী ছুঁতে পারবো না। আমাদের বাড়ীর ছেলেরা কেউ চিরুণী ছোঁয়না। তুমি জানোনা বোধহয়—না?

মল্লিকা বললে, সেইজন্যেই বুঝি সকলের কদমফুলের মতন চুল-ছাঁটা?

হ্যাঁ, তাই বটে।—ব'লে হরিমোহন গরদের ধুতিখানা কোমরে জড়িয়ে মাথার টিকিটায় একটা ফাঁস বেঁধে নিল।

মল্লিকা হাসবে কিম্বা হাত-পা ছড়িয়ে চীৎকার ক'রে কাঁদতে বসবে, ঠিক ঠাহর করতে পারলোনা।

ঘরে স্ত্রীর কাছে বেশিক্ষণ থাকতে হরিমোহনের সাহস নেই, গভীর রাত্রি ভিন্ন স্বামীস্ত্রীতে দেখাশোনা এবাড়ীর বিধিবহির্ভূত। কোনো রকমে কাজ সেরে হরিমোহন চুপি চুপি পালিয়ে যাচ্ছিল, মল্লিকা তাকে ডাকলো। বললে, সকাল বেলা কি যে বল্‌বে বলেছিলে ?

হরিমোহন ফিরে দাঁড়ালো। বললে, হ্যাঁ, বলছিলুম্ কি —মানে, কিছু মনে ক'রো না, ওরাই বলাবলি করছিল, তোমাকে নাকি বই পড়তে দেখেছে ওরা।

বই পড়া কি বারণ ?

হরিমোহন হেসেই অস্থির, হাসতে হাসতেই সে বেরিয়ে চ'লে গেল এবং মল্লিকা জানে, সমস্তদিনে তার সঙ্গে দেখা হবার আর কোনো সম্ভাবনা নেই।

আমীষরান্নার বিন্দুমাত্র সংশ্রব এ বাড়ীতে খুঁজে পাওয়া যায় না। তরকারীগুলো মধুর রসে একপ্রকার অখাদ্য। শাড়ির সঙ্গে আটপৌরে জামা পরা এখানে মেয়েদের পক্ষে নিন্দার কথা। শেষরাত্রে উঠে স্নান না করলে সামাজিক অপরাধ। মল্লিকা দিনে দিনে যেন হাঁপিয়ে ওঠে। এমন আবহাওয়ায় সে মানুষ হয়নি, সে দোষ তার নয়। প্রতিদিনই সে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে লাগলো, তার ওপর একটা প্রকাণ্ড

অন্যায় করা হয়েছে। আলো আর বাতাস থেকে তাকে ছিনিয়ে ফেলা হয়েছে এক অন্ধকূপে।। এইরূপ অদ্ভুত সংসারে চিরদিন তাকে বাস করতে হবে এই কল্পনা করতে গিয়ে মল্লিকার নিশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে এলো।

হরিমোহন একদিন পা টিপে টিপে এসে পিছন থেকে দুহাতে স্ত্রীর দুই চোখ টিপে ধরলো। হরিমোহনের বলিষ্ঠ সুন্দর দুই হাতে ফুল-বেলপাতা আর চন্দনের মৃদু মধুর গন্ধ। মল্লিকা গম্ভীরভাবে তার হাত দুখানা সরিয়ে দিয়ে বললে, জানি, ছাড়ো!

— হরিমোহনের হাসি আর ধরে না। কিন্তু পলকের মধ্যে আয়নার ভিতরে চোখ পড়তেই দেখা গেল, স্বামী-স্ত্রী পাশা-পাশি। একজনের সঙ্গে আরেক জনের কী বিচিত্র পার্থক্য। মল্লিকার মুখে রুজ-পাউডারের আভা, দুই আয়ত চোখে সুর্মা টানা, কপালে চুলের আঙট্ ঝুমকো-লতার মতো নামানো। আর তার পাশে আচায্যিদের নাতি, মাথায় টিকি, ছোট ছোট ছাঁটা চুল, গলায় সামবেদী পৈতার গোছা—চোখে মুখে বিদ্যাবুদ্ধি অপেক্ষা সারল্য আর সাত্বিক ভাব। রসবোধ অপেক্ষা কৌতুকবোধের দিকে ঝোঁক বেশি। সুশ্রী যুবক সন্দেহ নেই, একে ভালোবাসাও সহজ—কিন্তু শিক্ষার পালিশ আর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা না থাকলে মল্লিকার কেমন ক'রে চলবে? এর সঙ্গে পারিবারিক জীবন অচল, কারণ যৌথ-পরিবারের

আওতায় থেকে এর কোনো স্বকীয়তা জন্মায়নি। এর সঙ্গে সামাজিক জীবনও অসম্ভব, কারণ বাইরের জীবনযাত্রার গতিরহস্য এর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

হরিমোহন আস্তে আস্তে বললে, বৌ, রাগ করলে?

মল্লিকা বললে, বৌ ব'লে ডাকো কেন? আমার নাম রাণী।

নাম ধরতে নাই যে।

সে কি, তাহ'লে বলো আমিও তোমার নাম ধ'রে ডাকতে পারবো না?

হরিমোহন অবাক হয়ে গেল। স্ত্রী স্বামীকে নাম ধ'রে ডাকতে চায় এ তার কল্পনাতীত। পরিহাস মনে ক'রে সে হাসিমুখে বললে, ওকথা কি বলতে আছে?

বলতে আছে কিনা সে আমি জানি। বলো যে এখানে সে-রীতি চলবে না। যাক্ গে। তুমি হাত-কাটা ফতুয়া আর উড়ুনি গায়ে দিয়ে পথে বেরোও কেন, বলো দেখি?

তার গলার আওয়াজে এমন একটা কঠিন নির্দেশের চিহ্ন যে, হরিমোহন সহসা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালো। তারপর বললে, ওটাই যে আমাদের অভ্যেস। শীতকালে কেবল বালাপোষ গায়ে দিই।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে মল্লিকা বললে, বগলে পুরনো ছাতি, কাঁধে উড়ুনি, গায়ে ফতুয়া—তোমার সঙ্গে নাপ্‌তের তফাৎ কি?

রসিকতা ক'রে হরিমোহন বললে, তফাৎ কেবল আমার মাথায় টিকি.?

না, ও-অভ্যেসটা তোমাকে ছাড়তে হবে। উড়ুনি নাও ক্ষতি নেই, কিন্তু পরণে ধুতি আর পাঞ্জাবী—আর পায়ে বিদ্যেসাগরী চটি ছেড়ে য়্যালবার্ট।

কিন্তু দাদু যে রাগ করবেন ?

মল্লিকা বললে, এতেই যদি তিনি রাগ করেন তবে ঘুমের ঘোরে কাঁচি দিয়ে একদিন তোমার টিকিও কেটে দেবো। ছি ছি, আমার বন্ধুরা কোনোদিন তোমাকে দেখলে আমাকে গলায় দড়ি দিতে হবে।

হরিমোহনের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, ভয়ার্ত মুখে সে চুপ ক'রে রইলো। বৃদ্ধ আচার্য মহাশয়ের প্রতি যে অশোভন কটাক্ষ উচ্চারিত হোলো, সে-আঘাত হরিমোহনের মর্মে গিয়েই বিঁধলো।

কিন্তু মল্লিকা সেখানেই থামলো না। স্বামীর নতমুখের দিকে চেয়ে বললে, তুমি না কল্‌কাতার ছেলে ? আজকাল কত রকমের চালচলন, কিছুই কি চোখে পড়েনা তোমাদের ? ইংরেজি লেখাপড়া শেখেনি, এমন একজন ছেলেও তুমি দেখাতে পারো ? না শিখেছ ম্যানার্স, না এটিকেট্। হাতে রুদ্রাক্ষের তাগা বেঁধেছ কেন ? ওতে তোমার কি লাভ বলতে পারো ?

অপরাধীর মতো মুখ ক'রে হরিমোহন বললে, আমরা শৈব কিনা, তাই।

ছাই আর পাঁশ! ধর্মে মতি খুব ভালো, ভণ্ডামি কেন? তুমি আশা করছ আমি তোমার মতন হবো, আমিও ত আশা করতে পারি, তুমি হবে আমার মতন? ঘণ্টা নাড়া আর পূজো আর চাল-কলা বাঁধা—লোকের কাছে আমার মুখ দেখাতেও লজ্জা করে!

হরিমোহন সবিনয়ে বললে, আমি কি তোমার যোগ্য নই, বৌ?

সে-কথা হচ্ছে না—মল্লিকা চাপা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, তোমাদের রুচি আর শিক্ষা নিয়ে কথা হচ্ছে। মানুষ আর বনমানুষের প্রভেদ নিয়ে কথা হচ্ছে।

হরিমোহন ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকালো। তারপর মৃদুকণ্ঠে—ঘরের বাইরে কেউ না শুনতে পায়—এম্‌নি ভাবে বললে, আমাকে তুমি কি করতে বলো?

বলবো কা'কে, আমার কথা যে বুঝতেই পারবে না? তুমি কি কোনোদিন আমাকে চেনবার চেষ্টা করেছ?

না।

চেষ্টা করলে বুঝতে, এখানকার ছাঁচ আজকের দিনে কেউ সহ্য করতে পারবে না। চারিদিকে উঁচু পাঁচিল, সদর দরজা বন্ধ—বাইরের হাওয়া আসে না, খবর আসে না, কথা আসে না। কেউ বাঁচতে পারে এখানে?

হরিমোহন বললে, তুমি কি চাও ?

মল্লিকা বললে, তোমাকে বুঝে নিতে হবে। আমি ছিলুম ডিবেটিং ক্লাবের প্রধান বক্তা—

তা বুঝতে পারছি।—হরিমোহন একটু হাসলো।

যতই হাসো, সত্যিটা মিথ্যে হ'য়ে যায় না। অল্ ইণ্ডিয়া লেডিস্ কন্‌ফারেন্সের আমি ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী, পর্দানিবারণী সমিতির আমি মেম্বর—তুমি বলতে চাও সমস্তই ত্যাগ ক'রে ভট্‌চায্যিদের পূজো নিয়ে থাক্‌বো ? তুমি জানো, ভবানীপুর 'মহিলা-সমাজ' আমারই হাতের তৈরি ? তুমি এও বোধ হয় শোনোনি, আমার একটা পলিটিক্যাল ক্যারিয়রও আছে !—এক নিশ্বাসে কথাগুলো ব'লে মল্লিকা হাঁপাতে লাগলো।

ওদিকে নারায়ণের ঘরে সন্ধ্যারতির লগ্ন প্রায় আসন্ন। আসছি।—ব'লে হরিমোহন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে ভাবতে লাগলো, সর্বনাশ, এ কা'র সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে ? একে নিয়ে তার ভবিষ্যৎ ?

জানলার ধারে মল্লিকা কঠিন হয়ে ব'সে রইলো। চারিদিকের এই অবরোধী আবহাওয়ার মধ্যে ব'সে তার মনে হোলো বাইরেটাও যেন রুক্ষ, যেন তৃষ্ণার জিহ্বা মেলে ধরা। সহসা, যতদূর দেখা গেল, তার জীবনটা ভয়ানক বিপন্ন। এ বিয়েতে বিন্দুমাত্রও তার তৃপ্তি হয়নি। সন্দেহ নেই, হরিমোহনের চেহারা আর প্রকৃতি ভালোবাসবারই মতো,

কিন্তু সে অন্ধগুহাবাসী। মল্লিকার বয়স কম হয়নি, সে জানে অগ্নিস্রাবী যৌবনের মাদকরস সহজেই একদিন ফুরিয়ে যাবে—কিন্তু তারপরে সর্বপ্রকারে তার জীবন হবে বিড়ম্বিত। এই পারিপার্শ্বিক সহ্য করা হবে তার পক্ষে কঠিনতম সমস্যা। একটু আগে নিজের আত্মাভিমান হরিমোহনের কাছে সে প্রকাশ ক'রে ফেললো। জানে, এ প্রবৃত্তি অশোভন; নিতান্তই বাধ্য হয়ে তাকে এই আত্মহত্যা করতে হোলো। কিন্তু তার নিজের পরিচয় যাই হোক, তার প্রাথমিক দাবিগুলি যদি পূর্ণ না হয় তবে কি তার জীবন ব্যর্থ নয়? তার রুচি আর শিক্ষামতো কিছুই যদি সে না পায়, তবে নিজেকে দৃঢ় ক'রে দাঁড় করানো কি তার এত বড় সামাজিক অপরাধ? অনুকূল অবস্থা না পেলে স্নেহ ভালোবাসা আসবে কোন্ পথ দিয়ে?

মাস তিনেক এমনি ক'রেই কাটলো।

কয়েকদিন আগে থেকেই মল্লিকার মন ভালো ছিল না। বেশ বোঝা যায়, পারিবারিক এক চক্রান্ত চলেছে তার বিপক্ষে, এ বাড়ীতে সে প্রিয় নয়। ফলে, সকলের মাঝখানে থেকেও সে একা। তার স্নানাহার, তার সাজসজ্জা, তার চলন-ধরণ সমস্তগুলোই এ পরিবারের ঐক্যপ্রণালী থেকে বিচ্ছিন্ন একটা চড়া সুর, এখানকার হাওয়ায় সে যেন বিরূপতা অনুভব করে।

এই এক ঘেয়ে অস্বস্তির ওপর একদিন একটুখানি বৈচিত্র্যের ধাক্কা পড়লো।

দুপুরে এই সময়টায় রোজই হরিমোহন পুরাণপাঠ, শিষ্যসেবকের বিলিব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে বাড়ীতেই ব্যস্ত থাকে, কিন্তু সেদিন সে বাড়ী ছিল না। তাদের টোলের পরীক্ষায় আচার্যের সঙ্গে তাকেও উপস্থিত থাকতে হয়েছিল, তাছাড়া উপাধি বিতরণ সভার কাজকর্মও কিছু ছিল। এমন সময় একদল অভ্যাগত স্ত্রী-পুরুষ বাগান পেরিয়ে বাড়ীতে এসে ঢুকলো। খবর পাওয়া গেল, তারা মল্লিকার সাক্ষাৎপ্রার্থী। এ বাড়ীর নিয়ম হোলো, মেয়েরা নিচের তলাকার বৈঠকখানার দিকে কখনোই অগ্রসর হবে না। কিন্তু আজ মল্লিকা অম্লানবদনে সেই বিধি লঙ্ঘন ক'রে নিচের তলায় নেমে সোজা বৈঠক-খানায় এসে হাজির হোলো।

তিনটি যুবকের সঙ্গে চার পাঁচটি তরুণী তাকে দেখে একসঙ্গে সোল্লাসে কলরব ক'রে সারা বাড়ী মুখর ক'রে তুললো। তাদের সেই সমগ্র মিলিত কণ্ঠস্বর এই প্রাচীন বনেদী এবং রক্ষণশীল বাড়ীর সমস্ত ভিতগুলোর সন্ধিস্থানে হাতুড়ি মেরে মেরে যেন ধরাশায়ী ক'রে দিতে লাগলো। কাছাকাছি কারুকে দেখা গেল না বটে, কিন্তু মল্লিকার মনে

হোলো—আতঙ্কে, উৎকণ্ঠায়, উদ্বেগে সারা বাড়ীর মানুষরা একটি মুহূর্ত্তেই স্তম্ভিত হয়েগেছে।

একটি পলক মাত্র, তারপরই হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে মিসেস রেবা রায় আর অলকা মিত্রের হাত ধ'রে অভ্যর্থনা জানিয়ে মল্লিকা বললে, এসো—আসুন অরিন্দমবাবু, আসুন বিজনবাবু। তারপর? হঠাৎ যে? কি মনে ক'রে?—চলো ওপরে, আমার শোবার ঘরে। রতীনবাবু, আপনি সেই যে শীলং গেলেন, তারপর আর কোনো খোঁজ পেলুম না কেন বলুন ত?

অরিন্দম হাসি টিপে বললে, ও কি আর আমাদের মতন গরীবদের খবর রাখে? He was engaged elsewhere.

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে রেবা-অলকা-বিজনরা উচ্চহাস্যে ঘরবাড়ী ভরিয়ে দিল।

আপ্যায়ন আর অভ্যর্থনার ত্রুটি হওয়া ত দূরের কথা, আজ বরং তারই একটা চেষ্টাকৃত অতিশয়তা দেখা গেল। কোথাও স্খলন নেই, কোনো বিচ্যুতি নেই—আদ্যোপান্ত হিসাব নিকাশে একেবারে সুসমন্বিত। মল্লিকা চঞ্চল হয়ে, উত্তেজিত হয়ে, উচ্ছ্বসিত হয়ে গা ঢেলে দিল এই কোলাহল মুখর আসরে। ওরা কেউ বোধ হয় বুঝতে পারলো না, মল্লিকা নানা কথার কৌশলে শ্বশুরবাড়ীর আসল চেহারাটা ওদের কাছে ঢেকে রাখতে চায়, নানাবিধ ছলনায়

হরিমোহনের প্রসঙ্গটা এড়িয়ে পালিয়ে চলে। ওরা যখন বললে, মল্লিকা, একটা গান গাও, তোমার চমৎকার গলা অনেকদিন শুনিনি। মল্লিকা তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল। বাবার দেওয়া যৌতুকের হারমোনিয়মটা দ্রুত হস্তে বা'র ক'রে সে ধরলো 'গীতবিতানের' একখানা গান। তার সেই দীর্ঘ মধুর মসৃণ কণ্ঠস্বরে শরৎ-শেষের মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল নীলাকাশ ক্ষণে ক্ষণে শিউরে উঠতে লাগলো। হাস্যে, লাস্যে, কটাক্ষে আগেকার সেই মল্লিকাকে নতুন ক'রে দেখে বিজন, অরিন্দম আর রতীন সমাধিস্থ হয়ে রইলো।

রেবা-অলকারা ধ'রে বসলো, আজ বেলা তিনটার শো'তে মেট্রোয় যেতে হবে। অনেক কাল পরে আজ এই সুযোগ।

এইমাত্র! প্রস্তাব শোনামাত্রই মল্লিকা নেচে উঠলো, বর্ষার মেঘের কটাক্ষে যেমন ময়ূরী নৃত্য ক'রে ওঠে। সত্যি বলতে কি, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে তার কুমারীকালের মতো সুরুচিসম্পন্ন সজ্জায় এসে দাঁড়ালো। যেন দীর্ঘকাল থেকে সে উপবাসী, তৃষ্ণার্ত—সমস্ত প্রাণ, সমস্ত মন অদ্ভুত অধীর ক্ষুধা তৃষ্ণায় চঞ্চলিত। তার দিকে তাকিয়ে তিনটি যুবকের ইহকাল ঝরঝরে হয়ে গেল।

মল্লিকা বললে, যাচ্ছি, কিন্তু একটি সর্তে। তোমরা আজ আমার অতিথি, আজকের সব খরচ আমার।

সবাই বললে, বেশ বেশ, খুব ভালো।—এই ব'লে তারা

আবার সিঁড়ি দিয়ে বাড়ীময় সাড়াশব্দ জাগিয়ে নেমে চললো।

মল্লিকাও নামবে, এমন সময় ধীরপদে দিদিশাশুড়ী এসে দাঁড়ালেন। বললেন, নাৎ-বৌ, ওঁরা কে?

ওঁরা?—মল্লিকা থমকে দাঁড়ালো। বললে, ওঁরা সবাই আমার কলেজের বন্ধু।

তুমি যাচ্ছ কোথায়?

একটু বেড়াতে—সিনেমায়—

ওঁদের সঙ্গে?

হ্যাঁ।

কর্তার মত নিয়েছ কি?

তিনি ত বাড়ী নেই, আপনাকেই জানিয়ে যাচ্ছি। ওঁদের বলবেন, সন্ধ্যে নাগাৎ ফিরবো।

গট্ গট্ ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে মল্লিকা দ্রুতপদে বন্ধুদের সঙ্গে চ'লে গেল। তার প্রতি পদক্ষেপে এই বংশের শিক্ষা-দীক্ষার ধারা দলিত মথিত হ'তে লাগলো। বিমূঢ় নিস্পন্দ দিদিশাশুড়ী নির্বাক চেয়ে রইলেন। মেয়েটার অদ্ভুত স্পর্ধা বটে!

সিনেমা থেকে বেরিয়ে মল্লিকারা গিয়েছিল ইম্পিরীয়লে. সেখান থেকে হগ মার্কেট্ ঘুরে ময়দানের হাওয়া খেয়ে যখন তারা যে-যার বাড়ীর দিকে চললো, মল্লিকা বিজনকে এস্কর্ট্ নিয়ে ট্রামে উঠে বসলো। অতঃপর শ্বশুরবাড়ীর ফটকের

কাছে এসে সে যখন হাত তুলে বিজনকে 'চিয়ারো' ব'লে বিদায় দিয়ে ভিতরে ঢুকলো, আচার্য মহাশয় গীতার পৃষ্ঠা থেকে মুখ তুলে তার দিকে তাকালেন। সন্ধ্যা তখন সাড়ে সাতটা।

ভ্রূক্ষেপ না ক'রে মল্লিকা অগ্রসর হচ্ছিল, আচার্য গম্ভীর প্রশান্ত কণ্ঠে তাকে ডাক দিলেন—নাৎ-বৌ দিদি, আপনি একটু অপেক্ষা করুন বৈঠকখানায়।

বৈঠকখানায়! বিস্ময়জনক নির্দেশ বটে। মল্লিকা থমকে সেইখানেই দাঁড়ালো। আচার্য ভিতর থেকে উঠে বাইরে এসে দাঁড়ালেন—এবং অপ্রত্যাশিত, হরিমোহন এলো তাঁর পিছনে পিছনে।

দৃঢ় স্মিতকণ্ঠে আচার্য বললেন, ভেতরে কিম্বা ওপরে আপনার আর যাবার দরকার নেই। আমি ইতিমধ্যেই সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছি। আপনার আসবাবপত্র সবই ধর্মতলার বাসায় চ'লে গেছে। স্বামীস্ত্রীতে সাবধানে ভদ্রভাবে থাকবেন। হ্যাঁ, খরচপত্র সমস্তই নিয়মিত যাবে—মানে, মাসে দুশো টাকা। আমার কর্তব্য থেকে কখনো পশ্চাদ্‌পদ হবোনা। অন্যান্য সকল কথাই হরিমোহনকে আমি ব'লে দিয়েছি, অসুবিধে কিছু হবেনা। আপনার আর কিছু বলবার আছে কি?

দুই পা থর থর ক'রে মল্লিকার কাঁপছিল। ভূমিকম্পের

একটা প্রচণ্ড নাড়ায় সে যেন কেমন বিকল হয়ে গেছে। নিজেকেই সে একটা চাবুক মেরে সজাগ ক'রে তুললো। বললে, না।

ফটকের কাছে একখানা মোটর গাড়ী এসে দাঁড়ালো। আচার্য বললেন, দেরি হয়ে যাচ্ছে, আর কিছু তোমার বক্তব্য আছে, হরিমোহন?

অশ্রুকম্পিত কণ্ঠে হরিমোহন জবাব দিল, আজ্ঞে না।

স্ত্রীর প্রতি তোমার কর্তব্য বিবেচনা, স্নেহ—এগুলোর অভাব যেন কোনদিন না হয়। তোমাদের প্রতি আমার নিত্য আশীর্বাদ রইলো। আচ্ছা, এবার তা হ'লে দুর্গা ব'লে যাত্রা করো। সেখানে গিয়ে আবার রান্নাবান্না করতে হবে।

মল্লিকা হেঁট হয়ে তাঁর পায়ের ধূলো নেবার চেষ্টা করতেই আচার্য বল্‌লেন, থাক্ ছোঁবেনন। আমাকে নাৎ-বৌ দিদি, আমি আশীর্বাদ করছি।

দুজনে অগ্রসর হোলো। হরিমোহন বোধ করি দ্রুত আত্ম-গোপন করার জন্য গাড়ীতে উঠে গিয়ে বসলো। মল্লিকা এতক্ষণ পরে সহসা তার গ্রীবা হেলিয়ে নিঃসঙ্কোচ পরিচ্ছন্ন কণ্ঠে বললে, দাদামশায়, পায়ের ধূলোও নিতে দিলেন না? দেখছি এটা তাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়—কিন্তু আমি এ বাড়ীর বৌ—

ঘাড় নেড়ে বাধা দিয়ে আচার্য বললেন, এ বাড়ীর বৌ

আপনি নন্ নাৎ-বৌ দিদি, আপনি হরিমোহনের স্ত্রী, এই মাত্র। হ্যাঁ, কি বলছেন বলুন?

অপমানিত মুখ তুলে ফস ক'রে মল্লিকা ব'লে বসলো, ওঁর স্ত্রী না হ'লেও আমি দুঃখিত হতুমনা। এ কিন্তু বাড়ীর বৌ আমি নয়—একথা শুনেও আমি আনন্দ পেলুম।—থাকগে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, আপনি যা খরচের বরাদ্দ করেছেন, কল্‌কাতা শহরে তা নিয়ে চলবেনা।

চলবে।—আচার্য বললেন, ধর্মতলার বাড়ীটা আমার, সেখানে ভাড়া লাগবেনা। আপনারা মাত্র দুজন, ওতেই চল্‌বে। তবু, আপনার শেষ দাবি যুক্তিহীন হ'লেও আমি পূর্ণ করব। আড়াইশো টাকা ক'রে আপনাদের মাসিক খরচ বরাদ্দ রইলো।

মল্লিকা নীরবে গিয়ে গাড়ীতে উঠলো। গাড়ী ছেড়ে দিল। আচার্য উপর দিকে একবার চেয়ে নিজের মনে বললেন, তোমারই নির্দেশ, প্রভু।

মিনিট তিন চার ধ'রে দ্রুতবেগে গাড়ী ছুটে চললো। আঘাতটা সামলে নিতে মল্লিকার দেরি হয়নি। শ্বশুরবাড়ীর প্রতি মমত্ববোধ কিছু থাকলে একটু কষ্ট হোতো বৈকি। তবু কয়েদখানা থেকে মুক্তি পেয়ে বাইরের আলোয় এসে দাঁড়ালেও পরিত্যক্ত কয়েদখানার জন্য ছোট একটি নিশ্বাস পড়ে। মাত্র সেইটুকু, তার বেশি নয়। তার পাশে

হরিমোহন বিষণ্ণ বালকের মতো বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে। পুরুষ সে নয়—কিশোরী বালিকা যেমন গ্রামের স্নেহশৃঙ্খলিত জীবন ত্যাগ ক'রে অজানা শ্বশুরবাড়ীর পথে প্রথম যাত্রা করে, তেমনি নিঃশব্দ ব্যাকুল করুণ তার চাহনি। পথ, ঘাট, জনতা, নগরের অশ্রান্ত মুখরতা—ওদের কোনো অর্থ নেই। শত সহস্র লক্ষ্যবস্তুর দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেও চোখ দুটি তার ছিল আচার্যের দিকে। প্রিয়তম পৌত্র সে, পিতামাতার একমাত্র পুত্র সে, পারিবারিক সংস্কৃতির সে-ই যোগ্যতম প্রতিনিধি, তাকে নিয়ে কত আশা, কত আশ্বাস।

তার হাতের উপর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সহসা মল্লিকা বললে, সোজা হয়ে ব'সো। কেমন ক'রে গাড়ীতে চড়তে হয় তাও জানোনা?

হরিমোহন সোজা হ'য়ে বসলো। রাঙা দুটো চোখ ফিরিয়ে পরে সে বললে, আগে আমি কখনো মোটরে চড়িনি।

সহসা ঝড়ের মতো মল্লিকা হেসে উঠলো—কি যে করবো তোমাকে নিয়ে! চলো, খুব তোমাকে মোটরে চড়াব এখন থেকে। আমার কথার বাধ্য থাকবে ত?

অবাধ্যতা কা'কে বলে, হরিমোহন জীবনেও জানেনা। সে কেবল ঘাড় নেড়ে একান্ত নির্ভরতার সঙ্গে তার সম্মতি জানালো। মল্লিকা হঠাৎ খুশি হয়ে উঠলো। হরিমোহনের

গলাটা জড়িয়ে ধ'রে তার মাথায় হাত বুলিয়ে পুরুষের পাওনা বক্শিস চুকিয়ে দিল।

বাঁচলুম—হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম—মল্লিকা ফুকরে উঠলো, আর কিছু না হোক আমীষ রান্না খেয়ে বাঁচবো, অখাদ্য আর পেটে যাবেনা। আড়াইশো টাকায় আমাদের যা হোক চলে যাবে। বাড়ী ভাড়া লাগবেনা।

হরিমোহন গলাটা ছাড়িয়ে মুখ তুলে তার দিকে তাকালো। ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে বললে, তুমি কি মাছ, মাংস, পিঁয়াজ, ডিমের কথা বলছ? ওসব ত আমাদের খেতে নেই, বৌ?

দুরন্ত বালকের প্রতি বর্ষীয়সী নারী যেন সস্নেহে চেয়ে থাকে, তেমনিভাবে কিয়ৎক্ষণ হরিমোহনের দিকে স্মিতমুখে তাকিয়ে সহসা মল্লিকা পুনরায় চলন্ত গাড়ীর মধ্যে উচ্চ দীর্ঘ উল্লোলে হেসে উঠলো। তারপর বললে, কী বংশেরই মানুষ তোমরা, সব এক একটি পরমহংস! জীবে দয়া, অহিংসা, এতই যদি ছিল, বনে যেতে পারোনি? বিয়ে করেছিলে কেন? একথা শেখোনি, যড়রিপুর প্রথমটা থেকেই আর সবগুলোর উৎপত্তি?

কিন্তু তার সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনায় হরিমোহনের ঔৎসুক্য না দেখে মল্লিকা পুনরায় বললে, আচ্ছা, থাক, এসব কথা পরে হবে। আগে নিজের ইচ্ছে মতন ঘরকন্না পাতিগে।

ধর্মতলার বাড়ীতে ঢুকে মল্লিকা দেখলো—আশ্চর্য, উপর তলাকার দুটো ঘরে তাদের সমস্ত আসবাবপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ গোছানো। পাচক, দাসী এবং একটি ছোকরা চাকর তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আচার্য মহাশয় চার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে একেবারে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রে দিয়েছেন। মল্লিকা শোবার দুটো ঘর এবং বৈঠকখানায় বেড়িয়ে বেড়িয়ে তদারক করতে লাগলো। রান্না, ভাঁড়ার, বাথরুম—সমস্তই হাল ফ্যাশানের। লোকটার রুচি আছে বটে।

পাচক এসে দাঁড়ালো। বললে, কি রান্না হবে মা?

মল্লিকা অলক্ষ্যে একবার হরিমোহনের দিকে তাকালো। তার পর বললে, তুমি যাও ঠাকুর, আমি রান্নাঘরে গিয়ে দেখছি।

সেদিনকার আহারাদির ব্যবস্থা কতদূর কি হোলো বলা কঠিন, কিন্তু মল্লিকা সারাদিনের উত্তেজনার পর ঘুমিয়ে পড়তেই হরিমোহন সারারাত পথে-হারানো শিশুর মতো কেঁদেই ভাসাতে লাগলো।

পরদিন সকালে মল্লিকা বাইরে বেরোতেই চাকর খবর দিল, ব্রাহ্মণ পাচক তার চাকরি ছেড়ে দিয়ে ভোর রাত্রেই চ'লে গেছে।

কোন ক্ষতি নেই—ব'লে মল্লিকা কোমর বেঁধে কাজে লেগে গেল। চাকরকে বাজারে পাঠিয়ে সে স্নান সেরে এলো। হরিমোহন ইতিমধ্যে তার পূজা অর্চনা সেরে বইপত্র নিয়ে ব'সে গেছে।

প্রথম অবস্থায় একেবারে বিপ্লব বাধালে চলবে না। মল্লিকা স্থির করলো, তার দরকার মতো কিছু কিছু আহার্য ধর্মতলার হোটেল থেকে আনিয়ে দিলেই চলবে। চাকরটার মাইনে সে বাড়িয়ে দেবে। তারপর ধীরে সুস্থে দেখা যাক. হরিমোহনের টিকির সঙ্গে তার আহারের সঙ্গতি থাকে কিনা। সেও কেশব মুখুজ্যের মেয়ে, ছাড়বার পাত্রী সে নয়।

হাতীবাগানের কোন এক টোলে হরিমোহন ছাত্রদের পড়াতে যায়। সপ্তাহে একদিন করে যায় ভাটপাড়ায়—সুতরাং মল্লিকার অবসর অখণ্ড, স্বাধীনতা অবাধ। এর উপর স্বামী যদি বাধ্য হয়, নিয়মানুবর্তী হয়, তবে সুখ এবং স্বস্তি দুই। মল্লিকা যে হাওয়ায় মানুষ, যে শিক্ষায় তার বিদ্যা, তাতে পুরুষকে সন্দেহ করা তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু নীতিবীদ্ হরিমোহন সম্পর্কে তার কোন উদ্বেগ নেই, জ্বালা নেই। আর তার যে স্বামী—টিকি, নামাবলী, চাদর, চটি এসব বাদ দিলে অবশ্যই ভদ্রসমাজের যোগ্য। কিছু ইংরেজি শিক্ষা থাকলে অবশ্য ভালো হোতো, কিন্তু সংস্কৃতই বা কম কিসে? মেঘদূত আর শকুন্তলা আর কুমারসম্ভব আবৃত্তি সে যদি করতে বসে, তার উদাত্ত কণ্ঠে অন্তত রেবা-অলকার দলকে নিশ্চয়ই চমকে দেওয়া যেতে পারবে। আর ইংরেজি? মল্লিকা তার হাতখরচের জন্য দু-চারবার টুইশনি করেছে, স্বামীকে কাজ-চালানো ইংরেজি শেখাতে তার

অসুবিধে হবেনা। সেদিন সে কয়েকখানা ইংরেজী রীডার নিজেই কিনে নিয়ে এলো। হায় অজ্ঞানাচার্য, তুমি নাতিকে পণ্ডিত করেছ, মানুষ করোনি!

অবসর যখন তার অখণ্ড, তখন তার বিগত কুমারী-জীবনকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুলতে বাধা কি? স্বামী যখন তার করতলগত, স্বামী যখন নিরাপদ, তখন তার মনের গতিকে বিভিন্ন ধারায় পরিচালিত করা অসুবিধাজনক নয়। মল্লিকা অল্ ইণ্ডিয়া লেডিস কন্ফারেন্সের আগামী অধি-বেশনের জন্য প্রস্তাব রচনা করতে বসলো, 'পর্দানিবারণী'তে খবর পাঠালো এবং ভবানীপুরের যে 'মহিলা সমাজের' আপিসে এখন আর বাতি দেবার কেউ নেই, সেই ঘরটায় নতুন আপিস বসাবার জন্য সে একদিন গিয়ে ঝাড়ামোছার বন্দোবস্ত ক'রে এলো। বিয়ের পর যে-মেয়েরা আল্মারীতে বইপত্র তুলে রেখে কেবল মাত্র 'প্রসূতি-কল্যাণ' মুখস্থ করতে বসে, মল্লিকা সে-দলের মেয়ে নয়। স্বামী তার জীবনের সোপান, সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে। কে বলেছে, পুরুষকে খুশি করতেই মেয়েদের জন্ম? কে বলেছে, পায়ে পড়ে কান্না ছাড়া মেয়েরা আর কিছু জানে না? কে বলেছে, স্বামীর আদর্শ আর মতবাদ অনুকরণ ক'রে চলাই স্ত্রীর ধর্ম? সত্যকার প্রতিভাকে চিনতে দেরি লাগে, সেইজন্য শক্তিশালী স্রষ্টা যখন জন্মায়, সমসাময়িক

কাল তাকে বিদ্রূপ করে, গালাগালি দেয়। প্রতিভার পথ চিরকালই কণ্টকাকীর্ণ।

মল্লিকার অনেক কাজ। বিয়ের পরে তাকে অহেতুক অবরোধ করা হয়েছিল। অপরাধ ছিল না, শাস্তি ছিল। তার আধুনিক শিক্ষা, প্রগতিবাদী মন, তার কষ্টার্জিত বিদ্যা—সবগুলিকে অবমাননা আর উপেক্ষা করাই ছিল তার শ্বশুরবাড়ীর কাজ। স্ত্রীলোককে ওরা মানুষ বলেনি, বলেছে দেবী—কারণ পদদলিত হয়েও তারা মার্জনা করবে এই সুবিধা। দেবীর সিংহাসনে বসিয়ে তাকে চলৎশক্তিহীন ক'রে রাখলে সম্ভোগ-চক্রান্তের তৃপ্তি! পুরুষ লেলিয়ে দিয়ে তাকে মোহাচ্ছন্ন ক'রে রাখলে তার ধাত্রীবিদ্যাকে কাজে লাগানো যায়! ধন্য, হে রক্ষক!

একদিন সন্ধ্যার পর কোথা থেকে ঘুরে এসে মল্লিকা হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, এই যে, কখন এলে তুমি? সন্ধ্যাহ্নিক সেরেছ?

হরিমোহন বল্‌লে, হ্যাঁ। বেড়িয়ে এলে বুঝি?

না গো, বেড়াবার সময় নেই, অনেক কাজ। তোমাকে একটা খবর দিই। আসছে সতেরোই তারিখে আমার এখানে মহিলা-সমাজের একটা জরুরী সভা—অবশ্য রাত্রের দিকে। সেদিন ডিনারের ব্যবস্থাও করতে হবে। কিন্তু তোমাকে নিয়ে আমার যে ভয় করে!

শান্তকণ্ঠে হরিমোহন বললে, ভয় কেন ?

তুমি যা জবু-থবু, লোকে না নিন্দে করে।

কি করতে হবে বলো ?

করতে কিছুই হবে না, কেবল আমি যা বলবো তাই শুনবে। শুনবে ত ?

আমি কখনো তোমার অবাধ্য হইনি, বৌ।

আবার বৌ ! একটুও স্মরণশক্তি যদি তোমার থাকে ! বলো, বৌরাণী !—সহাস্য তিরস্কারে আর বিলোল চাহনিতে মল্লিকা পুরুষের আসক্তিকে খুঁচিয়ে তুলতে চাইলো।

হরিমোহন বললে, বলো কি হুকুম, বৌরাণী !

মল্লিকা তার পাশে এসে বসলো। আজ হরিমোহনের মুখের উপরে বিষাদের কোনো রেখা নেই, কেমন যেন নির্ম্মল প্রসন্নতা। প্রসাধন সে কখনো করেনি, আয়নায় সে কখনো মুখ দেখেনি, সে স্বল্পাহারী ও ধার্মিক—কিন্তু আজ মল্লিকা ভালো ক'রে চেয়ে দেখলো—ঘন পেশীসন্নিবিষ্ট দৃঢ় চোয়াল, মুখের উপরে স্বাস্থ্যের রক্তাভা, উন্নত কপাল, আয়ত শান্ত দুটি চোখ। হরিমোহন সত্যকার রূপবান।

কাণের মুক্তোর দুল দুলিয়ে মল্লিকা স্বামীর গলা জড়িয়ে বললে, তুমি নিজের ধর্ম রক্ষাতেই ব্যস্ত রইলে; কিন্তু তুমি দেখলে না, যে তোমার আশ্রিত, তারো আছে কিছু সাধ, কিছু বা কামনা।

কথাটা খুবই সত্য। আচার্য ব'লে দিয়েছিলেন, স্ত্রীর প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করবে না, কর্তব্য ভুলবে না। স্ত্রী সহধর্মিণী, জীবনসঙ্গিনী। মল্লিকা এবাড়ীতে আসার পর থেকে হরিমোহন মনে মনে তার প্রতি বিরক্তিবোধ করেছে। সে তার আজীবনের আত্মীয়বন্ধন ছিন্ন ক'রে এক নারীর হঠকারিতায় ঘর ছেড়ে এলো, এই অদ্ভুত অন্ধতার জন্য কয়েকদিন অবধি, সত্য বলতে কি, মল্লিকাকে সে ঘৃণা করেছে। কিন্তু এর ত কোন কারণ নেই, স্বচ্ছন্দ পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করার জন্যই ত মল্লিকা ছেড়ে এলো সব। হরিমোহন আজ স্ত্রীর আলিঙ্গনে নূতন আস্বাদ পেলো। চোখ ভ'রে তার নেশা লাগলো।

মৃদুকণ্ঠে সে বললে, অনেক রকমের ভুল আমার ঘ'টে গেছে, আমি তার জন্যে লজ্জিত। এবার তুমি যা বলবে তাই শুনবো।

কথা দিচ্ছ?

হ্যাঁ।

আমি যদি তোমার চাল-চলন আর খাওয়া দাওয়ার চেহারা বদলাতে চাই?

স্পন্দিত নিশ্বাসে হরিমোহন বললে, আমিষ?

স্বামীর গলায় জড়ানো হাতখানায় আর একটু জোর দিয়ে বললে, ধরো যদি তাই হয়?

তুমি তাতে সুখী হবে ?

আমি সুখী হবার চেয়ে তুমি এ-কালের যোগ্য হবে, সে-ই আমার আনন্দ। আমি ভাসতে চাই তোমাকে নিয়ে। এযুগের নেশায় আচ্ছন্ন হ'তে চাই। তোমাকে আমি অনেক শেখাবো।

হরিমোহন চুপ ক'রে রইলো। মল্লিকা তার গলা ছেড়ে দিয়ে উঠে যাবার পর তার চমক ভাঙলো, কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগলো। এই নারীর সান্নিধ্য যেন ভাঙনের সুরে ভরা—কাছে এলে সন্ত্রস্ত, সতর্ক থাকতে হয়। কি যে সে বলতে চায়, জানা কঠিন। কিসে খুশি হয় তাও অজ্ঞাত। কিন্তু তার দুরন্ত গতির সঙ্গে পদক্ষেপ মিলিয়ে না চলতে পারলে তাকে যেন হারাতে হবে। ভালোবাসা বড় নয়, সংসারধর্ম প্রয়োজন নয়—কেবল একটা দুর্বার গতি, একটা অন্ধ ভবিষ্যতের দিকে নিরুদ্দেশ যাত্রা, অকূলের দিকে অজানায় ভেসে চলা। এ মেয়ে কাছে এলে সব ভুলিয়ে দেয়। তার আক্রমণ থেকে নিজের দুর্গ রক্ষা ক'রে থাকা বড় কঠিন।

ধর্মতলার ধারে বাসা বাঁধলে কল্‌কাতা নগরকে হুকুমের মধ্যে পাওয়া যায়। মল্লিকার বাড়ীর নিচের তলায় নানাবিধ বিপনি বেসাতি। হরিমোহনকে সেদিন সঙ্গে নিয়ে সে এক 'সেলুনে' গিয়ে উঠলো। অভিজাত নাপিত কাঁচি হাতে নিয়ে তাদের বসতে জায়গা দিল। মল্লিকা বললে, এঁর

চুলটা কেটে দাও ভালো ক'রে। ক্লিপ্ লাগিয়ো সাবধানে —নিউ আমেরিকান কাট্ হবে।

বড় একখানা আয়নার সামনে চেয়ারে হরিমোহন বসলো। দোকানের অদ্ভুত সাজ আসবাব। নাপিতের কাছে সে মাথা পেতে দিল। নাপিত হরিমোহনের টিকির দিকে মল্লিকার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললে, এটা ?

ওটা কেটে দাও।

নাপিত তার কাজ আরম্ভ ক'রে দিল। মল্লিকা সকাল বেলার সংবাদপত্র নিয়ে বসে রইলো দোকানের একপাশে।

সমস্ত সকালটা সেদিন মল্লিকার বিশ্রাম রইলো না। এগারোটার পর স্বামী-স্ত্রীতে যখন ফিরলো, তাদের সঙ্গে মুটের মাথায় একরাশি জিনিসপত্র। তিনজোড়া জুতো, তার সঙ্গে মোজা। খান-পাঁচেক শান্তিপুরের ধুতি। অছেল মোল্লার দোকান থেকে কেনা হরিমোহনের জন্য ট্রাউজার, গেঞ্জি, শার্ট, কোট, নেকটাই—কি নয় ? জুয়েলারের দোকান থেকে সোনার বোতাম। হগমার্কেট থেকে আইভরি সিগারেট কেস। মণিহারি থেকে সুগন্ধী সম্ভার।

সতেরোই তারিখের বিলম্ব বেশি নেই। স্বামীকে ভদ্র-সমাজের উপযোগী ক'রে তোলার জন্য মল্লিকা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করতে লাগলো। মল্লিকাকে যারা জানে তারা স্বীকার করবে, বহু বিষয়ে সে অভিজ্ঞ। কেবল মাত্র বই

মুখস্থ করা কলেজী তরুণী সে নয়, ফ্যাশনেবল্ পল্লীর সব খবর সে রাখে। নাচ গান শিখিয়েছে সে বহু মেয়েকে, সে জানে ছবি আঁকতে, সূচীশিল্পে সে পারদর্শিনী। অলঙ্কার নিবাচনে তার জুড়ি কম—মণিপুরের কানের ঝুম্‌কো থেকে গুজরাটি চুড়ির ডিজাইন্ তার করতলগত। জাপানী মেয়েদের পারিবারিক কুসংস্কার আর আমেরিকান্ তরুণীদের প্রণয়ালাপের বিশেষ ঢং অবধি তার কণ্ঠস্থ। প্রণয়-প্রশ্রয়িণী সোসায়েটি-গার্লস্‌রা' কেমন সরল যুবকদের 'ব্ল্যাকমেল' করে সেও তার অজানা নয়। সে জানে, এটিকেট্ শিখতে হ'লে ইংল্যাণ্ড, উপন্যাস পড়তে হ'লে ফ্রেঞ্চ, আর রাষ্ট্রব্যবস্থা জানতে হ'লে রাশ্যা। সুতরাং হরিমোহনের মতো ছাত্র তার কাছে অতি সামান্য।

সতেরোই তারিখ নিকটবর্তী। তাদের 'মহিলা সমাজের' জরুরী অধিবেশনের সংবাদ কল্‌কাতার কাগজগুলোতে ছাপা হয়ে বেরিয়ে গেছে। রবিঠাকুরের দু'লাইন ফিকে আশীর্বাদ তাঁর সেক্রেটারীর মারফৎ ডাকে মল্লিকার হাতে এসে পৌঁচেছে। আমন্ত্রণলিপি চ'লে গেছে সভ্যদের কাছে। বাঙ্গলায় মহিলা-নেতা নেই, সুতরাং মল্লিকার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। অল্-ইণ্ডিয়া থেকে বহু নেত্রীর শুভকামনা এসেছে পত্রযোগে।

'ইংলিশ এটিকেট্' নামক বইখানা আদ্যোপান্ত মুখে মুখে অনুবাদ ক'রে মল্লিকা হরিমোহনকে শোনালো। উৎসাহ

ও উদ্যম কেবল নয়—প্রাণের অজস্রতা মল্লিকার অসামান্য। দীর্ঘ সাতদিন ধ'রে সে ইংরেজি রীড়ারখানা হরিমোহনকে দিয়ে মুখস্থ করালো। শেষ দিন শেষ রাত্রের দিকে ঘুমে হরিমোহনের চোখ জড়িয়ে এলেও মল্লিকা তাকে ছাড়লো না। তার স্মরণশক্তির পরীক্ষা করতে লাগলো।

—আচ্ছা বলো, আঃ ঘুমিয়োনা বলছি? বলো, ফুল্ মানে কি ?

হরিমোহন বললে, বোকা।

ডগ্ মানে কি ?

কুকুর।

হ্যাসব্যাণ্ড্ মানে কি ?

চাষা !

হোলোনা, হোলোনা—ঠিক ক'রে বলো। হ্যাসব্যাণ্ড্ মানে ?

গাধা।

আঃ কিচ্ছু মনে রাখতে পারো না তুমি! হ্যাসব্যাণ্ড্ মানে, স্বামী। মনে থাকবে ত ? আচ্ছা উইচ্ মানে কি ?

স্ত্রী।

মল্লিকা খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। বললে, ভাগ্যিস, এখানে কেউ নেই? সব ভুলে মেরে দিয়েছ? উইচ্ মানে ডাইনী, ওয়াইফ্ মানে স্ত্রী! মনে থাকবে? আচ্ছা, এবার ঘুমোতে পারো। রাত চারটে বাজে।

এর পরে সাজসজ্জা শেখানোর পালা। ভূতপূর্ব 'মহিলা-

একটি যুবক তাকে সোৎসাহে অভিনন্দন জানালো। বললে, আধঘণ্টা থেকে ব'সে আছি তোমার জন্যে, মল্লিকা।

মল্লিকা বললে, কেন, মিস্টার ব্যানার্জিকে দেখোনি?

দেখেছি, তিনি আমাকে বসিয়ে ওঘরে গেলেন। আঃ, অদ্ভুত মানিয়েছে তোমাকে। স্প্লেণ্ডিড্!

এমন সময় প্রশান্ত গম্ভীর মুখে হরিমোহন এসে দাঁড়ালো। তখন তার গা বমি-বমি করছে। হাত বাড়িয়ে একটি ছোট চিঠি মল্লিকার হাতে দিয়ে বললে, এটা প'ড়ো এক সময়ে।

কিসের চিঠি?

কিছু না, এমনি।

আচ্ছা পড়বো পরে। ওগো শোনো, এ আমার একটি বন্ধু, বন্ধুদের মধ্যে অন্তরঙ্গ—এর নাম সুব্রত সেন। আচ্ছা, বলো ত সুব্রত, ওঁকে এই পোষাকে কেমন মানায়?—মল্লিকা অধীর হয়ে উঠলো।

উচ্ছ্বসিত সুব্রত বললে, Oh, he's looking fine, f·স্তু. তুমি—তুমি যে আজ এঞ্জেল, মল্লিকা? কেবল কি মিস্টার ব্যানার্জি? আজ অনেকের মাথা ঘুরে যাবে।

বমির বেগ সামলে হরিমোহন মনে মনে আওড়ালো, এঞ্জেল! এঞ্জেল মানে স্বর্গবাসিনী পরী, দেবদূত। এমন সময় নিচে ধর্মতলার রাস্তায় মোটরের শব্দ হতেই হরিমোহন ছড়িটা হাতে নিয়ে নেমে গেল। মল্লিকা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে একবার

তাকালো। আজ যেন হরিমোহনকে কেমন রহস্যময় মনে হচ্ছে। কিন্তু যতই হোক, সুব্রতকে আর একটু তার সমাদর করা উচিৎ ছিল বৈকি। সামাজিক সৌজন্যটা তাকে শেখান হয়নি বটে।

সুব্রত বললে, উনি যাবেন না সভায়, মল্লিকা ?

যাবেন বৈকি, নতুন পোষাক পরার আনন্দে গায়ে হাওয়া লাগাচ্ছেন একটু। মানুষটি একটু সেকেলে, সুব্রত।

এমন সময় নিচে থেকে চাকর উঠে এলো! মল্লিকা তার বিরক্তি চেপে প্রশ্ন করলো, বাবু কোথায় গেলেন রে ?

চাকর বললে, তিনি মোটরে উঠে চ'লে গেলেন !

কোথায় ?

তা জানিনে, মা।

সহসা চিঠির টুকরোর কথা মনে পড়তেই মল্লিকা হাতের মুঠো থেকে চিঠি খুলে পড়তে লাগলো। সুব্রত রইলো সামনে ব'সে, সে কিছু বুঝতেই পারলো না।

"কল্যাণীয়াসু,

তোমাকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। আমাকে ক্ষমা করিয়ো। আমার খোঁজ-খবর লইয়ো না। আমার সামাজিক ক্ষতি হইলেও তোমার হইবে না, এই আশা লইয়াই দূরে থাকিব। ইতি—

হরিমোহন